চাঁদ দেখে রোযা-ঈদ

মূল উর্দু
শায়খ মাকসূদুল হাসান ফাইযী

অনুবাদ
আব্দুল হামীদ ফাইযী

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد:

চাঁদের ব্যাপারে কলহ মুসলিম সমাজে প্রায় রমযান ও দুই ঈদের সময় হয়েই থাকে। আম জনসাধারণ তার একটা সরল ফায়সালা চায় এবং ধারণা করে তা অতি সহজ। কিন্তু শরয়ী আরো অনেক জটিল বিষয়ের মতো সারা বিশ্বে এক দিনে রোযা-ঈদ করার বিষয়টিও উলামাদের নিকট বিতর্কিত। এটা কোন অন্তর্দেশীয় সমস্যা না হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর সমাধান খোঁজা এবং বিশ্বের বড়-বড় আলেম-উলামাদের তর্কালোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যিক।

এর জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র মক্কাস্থ ইসলামী ওয়ার্ল্ড লিগের অধীনস্থ 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'র ব্যবস্থা রয়েছে। তাহলে সেখানে কি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি?

একাধিকবার হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন ফায়সালা পাওয়া যায়নি। তাই সময়ে সময়ে সেই বিতর্ক বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজে ফাটল ধরে। একে অন্যকে তুচ্ছ করে, গালাগালি দেয়। অনেকে নিজেকে হিরো ও অপরকে জিরো মনে করে। আর মতানৈক্য যখন আম জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন 'কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে কে মানে কাহার বোল।'

অনেক দ্বীনী ভাই এ মর্মে আমাকে কিছু লিখতে বলেন। কিন্তু যেমনটি বললাম, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, সেখানে না নেওয়া হলে আমরা বাহির থেকে অল্প জলে ফরফর করলে কোন লাভ হবে না।

তবুও অনুরোধে ঢেকি গিলতে না গিয়ে সহজভাবে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটির অনুবাদ করলাম। আমার মতে এটি একটি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা। আশা এই যে, পুস্তিকাটি সত্যানুসন্ধানী মানুষদের মনের খোরাক জোগাবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করুন এবং এই পুস্তিকার লেখক, অনুবাদক ও সহায়কদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন। আমীন।

আব্দুল হামীদ ফাইযী, সঊদী আরব। ১০ রজব, ১৪৩৬হিঃ, ২৯/৪/১৫

সূচীপত্র

****

নতুন চাঁদ দেখার দুআ

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ الله.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলয়্যুমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। *(তিরমিযী ৩৪৫১, সিঃ সহীহাহ ১৮১৬নং)*

অবতরণিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (١) سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} (١٠٢) سورة آل عمران {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (٧١) سورة الأحزاب

রোযা শুরু করা এবং ঈদ পালন করার ব্যাপারটাকে শরীয়ত চাঁদ দেখা বা মাস ত্রিশ পূর্ণ হওয়ার সাথে দায়বদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٨٥) سورة البقرة

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন তাতে রোযা পালন করে।” *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)).

“চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ কর। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শা’বানের গুনতি ৩০ পূরণ ক’রে নাও।”[১]

[১] বুখারী ১৯০৯নং আবূ হুরাইরা কর্তৃক।

এ নির্দেশ একটি সার্বিক নীতি, যা সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। চাহে তাঁরা মদীনাবাসী হোক অথবা মক্কাবাসী, আরবের অধিবাসী হোক অথবা অনারবের অধিবাসী, নববী শতাব্দীর মানুষ হোক অথবা অন্য কোন শতাব্দীর, প্রত্যেকের জন্য এই নীতি, যার উপর ভিত্তি ক’রে নিজের রোযা, ঈদ ও হজ্জ পালন ক’রে থাকে। কয়েক শতাব্দী যাবৎ উলামা ও ফুক্বাহা এই নীতির উপর কায়েম থাকলেন এবং মুসলিম জনসাধারণও তাতে তাঁদের অনুসরণ করতে থাকলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু ফুক্বাহার নতুনত্ব অন্বেষণ ও চুলচেরা বিচারের কারণে সেই সার্বিক নীতি ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেল। এ ব্যাপারে দুটি মাসআলা স্পষ্টভাবে সামনে এল ঃ-

১। সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এক জায়গার চাঁদ দেখা কি যথেষ্ট? নাকি প্রত্যেক এলাকার লোক নিজ নিজ দর্শনের উপর নির্ভর করবে?

২। চাঁদ দেখার বদলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের হিসাবের উপর নির্ভর ক’রে আরবী বা শরয়ী মাসের শুরু ও শেষ মানতে পারা যায় কি না?

বরং আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে কিছু বন্ধু এই আওয়াজ উঁচু করেছেন যে, সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে কেবল মক্কা মুকার্রামার চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতে হবে। অথচ এটা এমন একটি বক্তব্য, আল্লামা আহমাদ শাকের ছাড়া যার বক্তা কোন আলেম ও ফক্বীহ নন।

এ বিষয়ে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অতীতে বহু কিছু লেখা ও বলা হয়েছে। বিভিন্ন ইলমী ও ফিক্বহী কমিটি এই বিষয়াবলী নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার অনুষ্ঠিত করেছে। বিশেষ ক’রে মক্কা মুকর্রামার বিশ্ব ইসলামী লীগ (রাবেত্বাতুল আ’লামিল ইসলামী)র পরিদর্শনে কর্মরত কমিটি ‘মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী’ (ইসলামী জ্ঞান-গবেষণাগার)এ উক্ত বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার গবেষণা করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানতে ‘মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী’ পত্রিকার ৩য় সংখ্যার ২-৩ খন্ড দেখুন।)

উক্ত পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে দুটি পরস্পর-বিরোধী রায় পেশ করা হয়েছে। কিছু প্রবন্ধকার ও আহলে ইল্ম এ কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, মুসলিম বিশ্বের সকলকে নিজেদের রোযা ও ঈদের সময় একতা বজায় রাখা শরয়ী ও সামাজিকভাবে আবশ্যক।

পক্ষান্তরে অন্য কিছু প্রবন্ধকার ও আহলে ইল্ম এই মত দিয়েছেন যে, শরয়ী দিক দিয়ে এক জায়গায় চাঁদ দেখে সারা বিশ্বে রোযা ঈদ করার কথা গ্রহণযোগ্য

নয় এবং বাস্তবে তা আমলযোগ্যও নয়।

সুতরাং এই মতানৈক্যের প্রভাব উপমহাদেশেও পড়ে। বিভিন্ন দ্বীনী পত্র-পত্রিকা ও জালসা-জুলূসে ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা করা হয়। বরং উক্ত বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বই-পুস্তকও দর্শনমঞ্চে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু জরুরী ছিল এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাতে মুসলিম জনসাধারণকে বিশেষ ক'রে তাদের বার্ষিক সভা-সম্মেলনের সময় দলাদলি ও মতানৈক্য থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে ১৩-১৪-১৫ মার্চ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ঝাড়খন্ড তথা বিহারের পাকুড়ে অনুষ্ঠিত ২৮তম অল-ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সে একটি ফিক্বহী সেমিনার রাখা হয়। যার মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সমস্যাবলীর উপর প্রবন্ধ লেখার জন্য লেখকগণকে চিঠি ও টেলিফোনের মাধ্যমে আবেদন জানানো হয়। সেই সমস্যাবলীর মধ্যে একটি সমস্যা ছিল 'এক স্থলে চাঁদ দেখা যথেষ্ট, নাকি উদয় স্থলের ভিন্নতার প্রভাব আছে?'

কন্ফারেন্সের ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্যদের সুধারণা ছিল যে, তাঁরা আমার মতো স্বল্প বিদ্যার তালেবে ইল্মকে যোগ্য মনে করে এ বিষয়ে লিখতে আদেশ দিলেন। কমিটির প্রধান আমাকে টেলিফোনযোগে বারবার লিখতে তাকীদ করলেন। যার কারণে মন না চাইলেও, লেখার জন্য প্রস্তুত হতে হল। আর সেটাই ছিল এই পুস্তিকা লেখার মূল কারণ।

এই পুস্তিকাকে আমি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে ভাগ করেছি ঃ-

* অবতরণিকা ঃ এতে মসনূন খুতবার পরে পুস্তিকা লেখার কারণ ও পদ্ধতি এবং সহযোগী ব্যক্তিবর্গের কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

* ভূমিকা ঃ এতে আলোচিত হয়েছে, শরয়ী মাস কী? মুসলিমদের দ্বীনী ও পার্থিব কাজকর্মে তার যোগসূত্র কী? শরয়ী মাস চেনার মাধ্যম এবং তার শুরু ও শেষ জানার উপায় কী?

* প্রথম অধ্যায় ঃ এতে উল্লিখিত হয়েছে, চাঁদ দেখার গুরুত্ব, চাঁদ দেখার জন্য আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া এবং তার শরয়ী বৈধতা, শরয়ী মাস প্রমাণ করার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করার শরয়ী মান ইত্যাদির সবিস্তার আলোচনা।

* দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এতে আলোকপাত করা হয়েছে, চাঁদের উদয়স্থলের

ভিন্নতা, তার প্রকৃতত্ত্ব ও সীমা এবং তা গণ্য বা অগণ্য হওয়ার বর্ণনা।

* তৃতীয় অধ্যায় ঃ এতে আছে,

১। সারা বিশ্বে এক জায়গায় চাঁদ দেখা যথেষ্ট, নাকি যথেষ্ট নয়?

২। সারা বিশ্বে এক জায়গায় চাঁদ দেখা যথেষ্ট, নাকি যথেষ্ট নয়---এ নিয়ে উলামাগণের মতামতের অবিশদ বর্ণনা।

৩। উক্ত বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এবং প্রত্যেক মতের দলীলাদির বিচার।

* চতুর্থ অধ্যায় ঃ সঠিক মত এবং লেখকের অভিমত।

* পরিশিষ্ট ঃ পুস্তিকার সারনির্যাস ও কিছু আবেদন।

আমার পূর্ণ প্রয়াস, প্রত্যেক কথাকে কিতাব ও সুন্নাহ এবং হকপন্থী উলামাগণের উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা এবং বিরোধীদের দলীলসমূহেরও পক্ষপাতিত্বহীনভাবে বিচার করা। তবুও নগণ্য লেখক একজন স্বল্প জ্ঞানের তালেবে ইল্ম ও ভুলে ভরা পুতুলতুল্য মানুষ। যদি হকের নাগাল পেয়ে থাকি, তাহলে তা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে। আর হক যদি সাথী না হয়, তাহলে তা আমার মন ও শয়তানের কারণে।

বড় কৃতঘ্নতা হবে, যদি আমি সেই বন্ধুবর্গ ও বদান্যগণের শুকরিয়া আদায় না করি, যাঁরা এ পুস্তিকা লেখার উদ্যোক্তা অথবা তাতে সহায়ক ও সহযোগী। বিশেষ ক'রে ভারতের কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস, যে আমাকে এর যোগ্য হিসাবে নির্বাচন করেছে যে, আমি উক্ত ইল্মী ও দাওয়াতী কন্ফারেন্সে একজন প্রবন্ধকার ও বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করি।

এ ছাড়া রয়েছেন আল-গাত্ব শহরের সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ, যাঁরা আমাকে কেবল কন্ফারেন্সে যাওয়ার অনুমতিই দেননি, বরং কর্তব্যরত অবস্থায় এ পুস্তিকা লেখার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং যে সকল বই-পুস্তকের প্রয়োজন পড়েছে, তা ক্রয় করার পূর্ণ এখতিয়ার দিয়েছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক দাওয়াতী কাজে তাঁরা আমার বড় সহযোগী প্রমাণিত হয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

'নূরে ইসলাম একাডেমী লাহোর'-এর মালিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু মওলানা শাব্বীর আহমাদ নূরানী সাহেবও বিশেষ শুকরিয়ার হকদার, যিনি নানা ব্যস্ততা ও অসুস্থতার মাঝেও পুস্তিকাটির আদ্যপ্রান্ত মন দিয়ে পড়েছেন এবং একাধিক জায়গায় তরমীমের পরামর্শ দিয়েছেন অথবা সংশোধন সাধন করেছেন।

সবশেষে নিজের স্নেহভাজন বেটা-বেটিদের শুকরিয়া জানাই, যারা এই পুস্তিকাকে কম্পিউটারে কম্পোজ-সহ প্রুফ-রিডিং ইত্যাদিতে সোৎসাহে অংশ নিয়েছে।

সত্য কথা এই যে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহের পর উক্ত সকলের সহযোগিতা আমার সঙ্গ না দিত, তাহলে এই নগণ্যের দ্বারা এ কর্ম পরিপূর্ণতায় পৌছত না।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ এই যে, উক্ত সকল ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই পুস্তিকাকে আমার এবং তাঁদের মাগফিরাতের মাধ্যম বানান। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.

মাকসূদুল হাসান ফাইযী
জমঈয়াতুল গাত্ব আল-খাইরিয়্যাহ
আল-গাত্ব, সঊদী আরব

ভূমিকা
শরয়ী মাস

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٥) سورة يونس

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য কক্ষসমূহ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। *(ইউনুসঃ ৫)*

উক্ত আয়াতে কারীমা সময় জানা, তারীখ ও হিসাবের জ্ঞান লাভ করা এবং মাস ও সাল নির্ধারণ করার ব্যাপারে বুনিয়াদী নীতি ও প্রক্রিয়ার মর্যাদা রাখে। মহান আল্লাহ সূর্যকে রশ্মি দান করেছেন এবং তার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন, যাতে দিন ও সপ্তাহের হিসাব রাখা সম্ভব হয়। আর চাঁদকে তিনি আলো দান করেছেন এবং তার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন, যাতে মাস ও বছরের হিসাব রাখা সহজ হয়। এইভাবে মহান আল্লাহ সপ্তাহ ও দিনের হিসাব এত সহজ করেছেন যে, শহুরে ও গেঁয়ো, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তি সহজে তা জানতে পারে। অর্থাৎ, সূর্য উদয় হলে দিন শুরু হয় এবং অস্ত গেলে দিন শেষ হয়ে গিয়ে রাত্রি এসে যায়। এইভাবে দিবারাত্রি সাত পূর্ণ হয়ে গেলে এক সপ্তাহ পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে যখন পশ্চিমাকাশে নতুন চাঁদ দেখা যায়, তখন নতুন মাস শুরু হয়ে যায়। এইভাবে যখন চাঁদ ২৯ বা ৩০ দিন গণনা পূর্ণ ক'রে আবার নতুনভাবে প্রকাশ পায়, তখন এক মাস শেষ ক'রে দ্বিতীয় মাস শুরু হয়। আর এইভাবেই যখন মাসের সংখ্যা ১২ পূর্ণ হয়, তখন এক বছর পরিপূর্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} (٣٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর

নিকট নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা হল বারো মাস। এর মধ্যে চারটি মাস হল নিষিদ্ধ (পবিত্র)। এটাই সরল বিধান। (তাওবাহ ঃ ৩৬)

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্ধারণ করা এ হল সেই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা, যা সকল জাতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যার দ্বারা লোকেরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব রক্ষা ক'রে আসছিল। কিন্তু শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং সহজতম পদ্ধতিতে তুষ্ট না থেকে প্রকৃতি ও শরয়ীগত পঞ্জিকা ছেড়ে দিয়ে লোকেরা 'নাসী' ও 'কাবীসা' অর্থাৎ, অধিমাস[২] বা মলমাসের বিদআত আবিষ্কার করেছিল। আরবের লোকেরা, এমনকি মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী লোকেরাও উক্ত বিদআত থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারল না। যার ফলে চান্দ্র মাসগুলির যে ধারাবাহিকতা মহান আল্লাহ রেখেছিলেন, তা নিজ মৌলিক অবস্থায় বহাল থাকতে পারল না। এই জন্য মহান আল্লাহ যখন এই একনিষ্ঠ দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলেন, তখন মাসসমূহের ধারাবাহিকতাকেও তার মৌলিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন এবং তাকেই 'সরল বিধান' ও সঠিক দ্বীন বলে নির্ধারণ করলেন। যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাসগুলির এই ধারাবাহিকতা এবং দিন ও বছরের এই হিসাবই সঠিক। এই হিসাবই গ্রহণ করা উচিত এবং নিজেদের দ্বীনী ও পার্থিব

---

(২) আরবের লোকেরা মাস ও সালের ক্ষেত্রে দুটি বিদআত রচনা করেছিল। প্রথম বিদআত ছিল 'নাসী'। 'নাসী' মানে দেরী করা, পিছিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা ছিল এই যে, মহান আল্লাহ যে চারটি মাসকে 'হারাম' (নিষিদ্ধ ও পবিত্র) মাস হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি মাস যথাক্রমে যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হাজ্জাহ ও মুহার্রাম ছিল। এই মাসগুলিতে মুশরিকরাও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানিকে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করত। কিন্তু যেহেতু তিন মাস একটানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনের বদলা নিতে বিরত থাকা একটা লম্বা সময় ছিল, যা তাদের ধৈর্যের বাইরে ছিল, সেহেতু ঐ মাসগুলির মধ্যে কোন এক মাসকে 'হালাল' (বৈধ) মাস গণ্য ক'রে যুদ্ধ ও লুণ্ঠতরাজ চালিয়ে নিত এবং তার বিনিময়ে (নিজেদের ইচ্ছামতো) কোন 'হালাল' মাসকে 'হারাম' গণ্য ক'রে নিয়ে তিন মাসের গণনা পূর্ণ ক'রে নিত।
দ্বিতীয় বিদআত ছিল 'কাবীসা'র। যাকে আমাদের দেশে অধিমাস বা মলমাস বলা হয়। অর্থাৎ, চান্দ্র বৎসরকে সৌর বৎসরের বরাবর করার জন্য প্রত্যেক তিন বৎসরে এক মাস যোগ ক'রে দিত। যাতে হজ্জ প্রত্যেক বছরে একই মৌসমে আগমন করে এবং হজ্জের সময় শীত-গ্রীষ্মের সমস্যাবলী থেকে রক্ষা পেতে পারে।

কাজকর্মকে উক্ত মাস ও সালের ভিত্তিতে চালানো উচিত।[৩]

এই সরলতার কারণে মহান আল্লাহ বান্দাদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজ-কর্মের দ্বীনী বা পার্থিব হিসাব সূর্যের উদয়াস্তের সাথে সন্নিবেশিত করেছেন। নামাযের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٧٨) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন (নামায)। ফজরের কুরআন (নামায) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮)*

পক্ষান্তরে মাসিক ও বাৎসরিক কাজকর্মগুলিকে চান্দ্র হিসাবের সাথে

---

(৩) কিছু উলামার ধারণা এই যে, 'নাসী' ও 'কাবীসা'র বিদআতের ফলে হজ্জ কখনও মুহার্রাম মাসে, কখনও যুল-ক্বা'দাহ মাসে, আবার কখনও বা অন্য কোন মাসে অনুষ্ঠিত হত। এই জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ এই ফরয আদায়ের জন্য দেরী করলেন। এমনকি আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর হজ্জ যুল-ক্বা'দাহ মাসে সংঘটিত হল। সুতরাং মহান আল্লাহ যখন অহীর মাধ্যমে নিজের নবী ﷺ-কে অবহিত করলেন যে, এ বছর হজ্জ তার নিজস্ব সময়ে সংঘটিত হবে, তখন তিনি হজ্জ করার সংকল্প করলেন। এই সেই 'নাসী'র বিদআত, যাকে মহান আল্লাহ হারাম ও কুফ্র বলে আখ্যায়ন করলেন এবং মহানবী ﷺ হজ্জের খুতবায় এ কথা ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে মাসসমূহের ধারাবাহিকতা সেই আসলত্বে ফিরে এসেছে, যার উপর তা সৃষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ মর্মে মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

((إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرَاً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَة، وذُو الحِجَّةِ، وَالُمحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشعْبَانَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল, তা এখন থেকে শেষ ক'রে দেওয়া হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। *(বুখারী ৪৪০৬, মুসলিম ৪৪৭৭নং, দেখুন ঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/১৪৫)*

সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ হজ্জ সম্বন্ধে বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١٨٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে) বল, উহা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৯)*

উক্ত উদাহরণের ভিত্তিতে অন্যান্য কর্মাবলীকে অনুমান করা যায়।

মোটকথা, ইসলামে চান্দ্র মাসই হল মূল বুনিয়াদ। তারই ভিত্তিতে মুসলিমদের ইবাদত ও কাজকর্মের মাস ও বছর নির্ধারণ করা হয়। চাঁদকেই ভিত্তি ক'রে শরয়ী মাস ও বছর স্থির করা হয়। এমনকি উলামাগণ নিজেদের কাজকর্ম ইত্যাদিতে অশরয়ী মাসের উপর নির্ভর করাকে অবৈধ বলেছেন এবং তারীখ ও পঞ্জিকাতে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন ও অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। এই কারণেই আমীরুল মু'মিনীন খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে চান্দ্র মাসের ভিত্তিতে হিজরী সাল গণনা শুরু করেছিলেন।

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا....} (٣٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা হল বারো মাস। *(তাওবাহ ঃ ৩৬)*

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, উলামাগণ বলেন, এই আয়াতের আলোকে মুসলিমদের জন্য ওয়াজেব যে, তারা তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের সময় নির্ধারণ, যাকাত আদায় এবং অন্যান্য সকল কর্মে আরবী সাল ব্যবহার করবে। তাদের জন্য রোমান বা অনারব সাল ব্যবহার করা বৈধ হবে না।[৪]

শরয়ী মাসসমূহকে জানার মাধ্যম

যেহেতু মুসলিমদের দ্বীনী ও পার্থিব সকল ব্যাপার চান্দ্র মাসের সাথে সন্নিবেশিত, সেহেতু তা জানা এবং তার শুরু ও শেষ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা একটি আবশ্যক বিষয়। যার জন্য শরীয়ত খুবই সহজ পদ্ধতি রেখেছে। তাই

(৪) তাফসীর রাযী ৮/৫৫, কুরতুবী ৮/৮৫, বিস্তারিত জানার জন্য লেখক কর্তৃক প্রণীত 'অফাদারী ইয়া বেযারী' ৩১৪-৩১৭পৃঃ দ্রঃ।

প্রত্যেক জায়গা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ অতি সহজে মাসের শুরু ও শেষ জানতে পারে; ঠিক সেইভাবে, যেভাবে দিবারাত্রির আগমন-প্রস্থান অতি সহজে জেনে থাকে। এটা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপারও বটে। কারণ তারীখ প্রত্যেকের জন্য জরুরী। প্রত্যেক যুগ ও সমাজের জন্য জরুরী। আর যে জিনিস সকল মানুষের জন্য জরুরী, তার জন্য আবশ্যক এই যে, তার প্রাপ্তি ও জ্ঞান লাভ অতি সহজে হবে। এই জন্যই মাসের শুরু ও শেষ হওয়ার ব্যাপারটা মহান আল্লাহও খুবই সহজ রেখেছেন। অর্থাৎ, ২৯ দিন পার হওয়ার পর চাঁদ দেখা যাবে অথবা ৩০ সংখ্যা পুরো ক'রে নিতে হবে। রমযানের রোযার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٨٥) سورة البقرة

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন তাতে রোযা পালন করে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

উক্ত ব্যাপারেই মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

অর্থাৎ, যখন তোমরা চাঁদ দেখো, তখন রোযা (শুরু) কর এবং (২৯ তারীখে) যখন তোমরা চাঁদ দেখো, তখন রোযা ছাড়ো। অতঃপর যদি (২৯ তারীখের সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে তার অনুমান কর (অর্থাৎ ৩০ দিন পূর্ণ ক'রে নাও)।[৫]

উক্ত আয়াত ও হাদীসে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ ইসলামের অন্যতম রুক্ন রোযা শুরু করার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং যদি শা'বানের ২৯ তারীখে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে আগামী কাল রমযান মাসের পহেলা তারীখ হবে এবং সেদিন রোযা রাখা ওয়াজেব হবে। অনুরূপভাবে রমযানের ২৯ তারীখের সন্ধ্যাবেলায় সূর্যাস্তের সময় যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে আগামী কাল শওয়াল মাসের প্রথম তারীখ হবে এবং সেদিন রোযা ছাড়া তথা ঈদ করা ওয়াজেব হবে। কিন্তু কোন কারণে যদি ২৯ তারীখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে মাসের ৩০ দিন পুরো করা আবশ্যক হবে। মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করার এটাই শরয়ী রীতি এবং এর উপর আমল

(৫) বুখারী ১৯০০, মুসলিম ২৫৫৬নং

ওয়াজেব। এ ক্ষেত্রে কোন জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্ বা পঞ্জিকাপ্রণেতার কথার উপর নির্ভর ক'রে ফায়সালা নেওয়া যাবে না।

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন,

« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا – وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ – وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ». يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ.

"আমরা নিরক্ষর জাতি। না লিখতে জানি, না হিসাব জানি। মাস এত হয়, এত হয়, এত হয়।" এ কথা বলে নবী ﷺ তৃতীয়বারে বৃদ্ধা আঙ্গুলকে গুটিয়ে নিলেন। (অর্থাৎ, তিনি দুই হাতের সমস্ত আঙ্গুল খোলা রেখে ২ বার ইঙ্গিত ক'রে ২০ এবং তৃতীয়বার ইঙ্গিতে বৃদ্ধা আঙ্গুল গুটিয়ে এক কম বুঝিয়ে ৯ তথা ২৯ দিন বুঝালেন।) মাস এত দিন, এত দিন, এত দিন বুঝিয়ে ৩০ দিন বুঝালেন।[৬]

অর্থাৎ, চাঁদের ব্যাপারে আমরা লেখাপড়া বা হিসাব গণনার মুখাপেক্ষী নই। আমাদের রোযা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তারকা ও নক্ষত্ররাজির ভ্রমণ-পরিভ্রমণের জ্ঞান রাখতে আমরা আদিষ্ট হইনি। বরং আমাদেরকে এমন এক স্পষ্ট আমল করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা আলেম ও জাহেল সবাই সমানভাবে জানতে পারবে। আর তা হল চাঁদ দেখা। সুতরাং ২৯ তারীখের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে মাস উনত্রিশের, নচেৎ মাস ত্রিশের গণ্য হবে।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

"তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি (কালক্রমে) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায়), তাহলে শা'বান (মাসের) গুনতি ত্রিশ পূর্ণ ক'রে নাও।"[৭]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে নিম্নলিখিত বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ-

১। মুসলিমদের কাজকর্ম---বিশেষ ক'রে ইবাদতে শরীয়তের নিকট কেবল

(৬) বুখারী ১৯১৩, মুসলিম ২৫৬৩নং, শব্দাবলী মুসলিমের।

(৭) বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ২৫৬৬নং, শব্দাবলী বুখারীর, আবূ হুরাইরা কর্তৃক। এরই কাছাকাছি শব্দে অন্য সাহাবী কর্তৃক সুনানে বর্ণিত হয়েছে।

চান্দ্র মাসের হিসাবই গণ্য হবে।

২। মাস শুরু ও শেষ চেনার একমাত্র উপায় হল চাঁদ দেখতে পাওয়া। এ ব্যাপারে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা বা পঞ্জিকার হিসাব নির্ভরযোগ্য নয়।

৩। শরয়ী মাস কখনো ২৯ দিনের হয়, কখনো ৩০ দিনের। না ২৯ থেকে কম হবে, না ৩০ থেকে বেশি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)).

অর্থাৎ, মাস ২৯ দিনের হয়, আবার ৩০ দিনেরও হয়। সুতরাং যখন চাঁদ দেখবে, তখন রোযা রাখবে এবং যখন চাঁদ দেখবে, তখন ঈদ করবে। আর যখন তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, তখন গুনতি পুরো ক'রে নেবে।[৮][৯]

৪। শরীয়ত মাসের শুরু ও শেষ জানার জন্য চাঁদ দেখার শর্ত এই জন্য আরোপ করেছে যে,

(ক) এ কাজ খুবই সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধাজনক।

(খ) এ হিসাব নিশ্চিত এবং এতে ভুলের সম্ভাবনা নেই।

(গ) এ ছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের ও পঞ্জিকার হিসাব কঠিন হওয়ার সাথে সাথে তাতে ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই জন্য উলামাগণ বলেন, চাঁদ দেখার ব্যাপারে এ উম্মতকে যে 'নিরক্ষর' বলা হয়েছে, তা প্রশংসা হিসাবে বলা হয়েছে।[১০]

৫। যদি জ্যোতিঃশাস্ত্র তথা পঞ্জিকার হিসাব বলে যে, চাঁদ হয়েছে কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যাবে না, তাহলে হিসাব গণ্য হবে না এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের

(৮) সুনানে নাসাঈ ২১৩৮নং, এ মর্মে ঈলার হাদীস রয়েছে সহীহায়ন ও সুনানে।

(৯) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উলামাগণ বলেন, চান্দ্রবৎসরের ১২ মাসের সকল মাস ২৯ দিনের হবে না এবং সকল মাস ৩০ দিনেরও হবে না। বরং কোন বছর ৬ মাস ২৯ দিনের হবে এবং ৬ মাস ৩০ দিনের। কোন বছর ৫ মাস ২৯ দিনের হবে এবং ৭ মাস ৩০ দিনের। ৩০ দিনবিশিষ্ট মাস ৭ থেকে বেশি হবে না এবং ২৯ দিনবিশিষ্ট মাস ৫ থেকে কমও হবে না। *(দ্রঃ সুবকীর আল-আলামুল মানশূর ২৪পৃঃ)*

(১০) মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/ ১৯৯-২০০

ভিত্তিতে রোযা ও ঈদের দিন ফায়সালা করা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি হিসাব বলে, চাঁদ হবার সম্ভাবনা নেই, অথচ লোকেরা বাস্তবে চাঁদ দেখতে পায়, তাহলে চাঁদ দর্শক মান্যতা পাবে, জ্যোতিষী হিসাব নয়। (অবশ্য শর্ত হল, দর্শক যেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন হয় এবং তার সাক্ষ্যের প্রতি ভরসা রাখা যায়।) এটা এমন একটি বিষয়, যার উপর উম্মতের সকল উলামা একমত।[১১]

৬। কেবল রোযা-ঈদই নয়, বরং মুসলিমদের সকল কাজকর্ম যেমন, যাকাত, মহিলাদের ইদ্দত, ঈলার সময়-সীমা, ঋণ পরিশোধের সময়-কাল ইত্যাদি সকল বিষয় চাঁদ দেখা ও শরয়ী মাস অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।[১২]

শরয়ী মাসের শুরু ও শেষ

পশ্চাতের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কোনও শরয়ী মাস ২৯ দিন থেকে কম এবং ৩০ দিন থেকে বেশি হতে পারে না। আর তা জানার একমাত্র মাধ্যম হল চন্দ্র দর্শন। যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল, মাসসমূহের শুরু ও শেষ হওয়ার বিষয়টি চন্দ্র দর্শন অথবা গুনতি ৩০ দিন পূর্ণ করার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতেই গত মাস বিদায় হবে এবং নতুন মাস শুরু হবে। তবে স্পষ্ট থাকে যে, এ ক্ষেত্রে সেই দর্শনই গণ্য হবে, যা সূর্যাস্তের পর অথবা অস্তের সাথে সাথে লাভ হবে। এ ব্যাপারেও সকল উলামা একমত। বলা বাহুল্য, যদি কখনো সূর্য ডোবার আগে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে তা গণ্য করা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ৩০ রমযানে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সূর্যাস্তের আগে রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে না। যেমন সেদিন পহেলা শওয়াল বলেও মেনে নেওয়া যাবে না। কারণ, গণ্য দর্শন হবে সূর্য ডোবার পর।[১৩]

এখান থেকে পরিষ্কার হয় যে, "চাঁদ দেখে রোযা কর, চাঁদ দেখে রোযা

---

(১১) মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/১৩২, আল-আলামুল মানশূর ২০পৃঃ, মিরআতুল মাফাতীহ ৬/৪৩৫, ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/১৯৯-২০০, সঊদী আরবের উলামা কমিটিও একমত হয়ে একই সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। দেখুন ঃ আবহাষু হাইয়াতি কিবারিল উলামা ৩/৩৪

(১২) মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/১৩৩-১৩৪, ১৪৩, ফাতাওয়াস সুবকী ১/২০৭

(১৩) ফাতহুল বারী ৪/১২১, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আল্লামা ইবনুল আবেদীনের পুস্তক 'তানবীহুল গা-ফিলি অল-অসনান' এবং আল্লামা আব্দুল হাই লখনবীর পুস্তক 'আল-ফালাকুদ দাওয়ার ফী রু'য়াতিল হিলালি বিন্ নাহার'।

ছাড়"---এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যাবে, তার পরের দিন রোযা কর অথবা তার পরের দিন ঈদ কর।[১৪]

শরয়ী দিন ও মাস এবং জ্যোতিষী দিন ও মাসের মধ্যে পার্থক্য

স্পষ্ট থাকে যে, একটি শরয়ী মাস পুরো ২৯ বা ৩০ দিনের হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক মাসের একটা দিন ২৪ ঘন্টার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্দের নিকট, যখন থেকে চাঁদ নিজ wane [১৫] থেকে দূর হতে শুরু করে, তখন থেকেই নতুন মাস শুরু হয়। সম্ভবতঃ তাঁদের নিকট মাস শুরু হওয়ার জন্য চাঁদের জন্মই বিবেচ্য, চাহে তা লোকেরা পশ্চিম গগনে দেখুক বা না দেখুক। কেননা, ঐ সময় চাঁদ নেহাতই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

জ্যোতিষীগণ লিখেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদের উক্ত সরল রেখা থেকে দূর হতে শুরু হওয়ার পর কম-সে-কম ৩০ ঘন্টা অতিবাহিত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন চাঁদ পশ্চিমাকাশে দৃশ্যমান হওয়া অসম্ভব।[১৬] যেহেতু এমন

---

(১৪) ফাতহুল বারী ৪/১৩১, মিরআতুল মাফাতীহ ৬/৪২৪

(১৫) জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিভাষায় wane বলা হয় সেই সময়কে, যে সময়ে চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় এসে উপস্থিত হয়।

(১৬) মওলানা আব্দুর রহমান কীলানী লিখেছেন, বর্তমান থিওরি অনুযায়ী এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একটি চান্দ্র মাসে দুইবার একটি সরল রেখায় এসে উপস্থিত হয়। আর এই ঘটনা তখন ঘটে, যখন চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে গিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথকে অতিক্রম করে। যখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে পড়ে, তখন পূর্ণিমা হয় এবং যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে আসে, তখন অমাবস্যা ২৮ তারীখ হয়। পরন্তু ২৭ বা ২৯ তারীখও হতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ হলে ১৪ তারীখ তথা পূর্ণিমার রাতেই হয়। আর সূর্যগ্রহণ হয় দ্বিতীয় অবস্থায়। কিন্তু এমন ঘটনা কম ঘটে, যার পিছনে অন্য আরো কারণ থাকে।

নতুন চাঁদ

দ্বিতীয় অবস্থায় যখন চাঁদ পৃথিবীবাসীর নিকট পরিপূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন চান্দ্র হিসাবে এর পরিণাম এই বুঝা যায় যে, গত চাঁদের মাস সমাপ্ত হয়েছে। এই অবস্থাকে conjuction (গ্রহসম্মেলন) বলা হয়। যখন চাঁদ পরিপূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়, তখন সে সময়টা ক্ষণস্থায়ী হয়। এর পরেই পঞ্জিকা হিসাবে নতুন চাঁদ শুরু হয়ে যায়। এক conjunction থেকে দ্বিতীয় conjunction এর গড় ব্যবধান ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ২৪ মিনিট হয়। এই ব্যবধান কোন মাসে ৫/৬ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধিও পেতে পারে। অনুরূপ কোন

অবস্থা দিবারাত্রির যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। এই ভিত্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবে নতুন মাসের শুরু এবং শরয়ীত অনুযায়ী নতুন মাসের শুরুর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, জ্যোতিষ মতে চান্দ্র মাসের সূত্রপাত কখনো রাত বারোটায় হয়, কখনো দিন বারোটায়। বরং রাত-দিনের যে কোন অংশে তার সূত্রপাত ঘটতে পারে। জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে এ কথা জরুরী নয় যে, চাঁদ পশ্চিমাকাশে দেখা যাবে। এই জন্য জ্যোতিষ মতে চান্দ্র মাস শরয়ী মাস অপেক্ষা ২৪ ঘন্টা বরং তারও পূর্বে শুরু হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ কোন মাসের ২৯ তারীখের আসরের সময় চাঁদ তার wane এ প্রবেশ করল। এখন জ্যোতিষ মতে নতুন মাস শুরু হয়ে গেল। কিন্তু শরয়ী মাস শুরু হতে তখনও ২৪ ঘন্টা অপেক্ষা বেশি, বরং কোন কোন দেশে ৪৮ ঘন্টা অপেক্ষা বেশি সময় অবশিষ্ট থাকবে। এইভাবে জ্যোতিষীদের মাস ও শরয়ী মাসের মাঝে ব্যবধান একদিন; বরং তার থেকেও বেশি হতে পারে। আর এইভাবেই জ্যোতিষী মাসের দিনের সংখ্যা ও শরয়ী মাসের দিনের সংখ্যাতেও স্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হবে। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, শরয়ী মাস ২৯ দিনের হবে অথবা ৩০ দিনের। অর্থাৎ, না ২৯ দিনের কম হবে, আর না ৩০ দিনের বেশি। পক্ষান্তরে জ্যোতিষীদের নিকট প্রত্যেক মাস ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট কিছু সেকেন্ড হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আবহাযু হাইআতি কিবারিল উলামা ৩/১০, অতঃপর অধিক আগ্রহীদের জন্য মওলানা ইকবাল কীলানীর মতামতের রণক্ষেত্র পুস্তক 'আশ্-শামসু অল-ক্বামারু বিহুসবান' বড় উপকারী।

কোন মাসে উক্ত পরিমাণ সময় হ্রাসও পেতে পারে। যেহেতু তার কোন নির্ধারিত সময়কাল নেই। এই সন্ধিক্ষণ সকাল ৯টাও হতে পারে অথবা রাত ১১টা। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয় যে, যেদিন conjunction ঘটবে, সেদিন রাতে চাঁদ দেখা যাবে। এর কারণ এই যে, প্রথমতঃ চাঁদ অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, দ্বিতীয়তঃ অস্তাচলের লাল আভা, যা প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত প্রভাবশালী থাকে। সুতরাং তার ফলে চাঁদ দৃশ্যমান হতে বাধা সৃষ্টি হয়।

এক দিন বা পুরো ২৪ ঘন্টা বয়সের চাঁদ কত সূক্ষ্ম হয়, তা এইভাবে অনুমান করা যায়; আপনি একটা তরমুজ নিন। তরমুজে কেবল ৮/১০টি দাগ থাকে। যদি আপনি তরমুজটিকে সমানভাবে কেটে ঐ দাগের মতো ৩০টি ফালি করেন, তাহলে ১টি ফালি যতটা মোটা হবে, এক দিনের চাঁদ ততটা মোটা হবে। কিন্তু তার দৈর্ঘ্য অর্ধ বৃত্তি হবে না, বরং অনেক কম হবে। *('আশ্-শামসু অলক্বামারু বিহুসবান' বই হতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত, দ্রঃ মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ ১৪/১২/৪০পৃঃ)*

প্রথম অধ্যায়
চন্দ্র দর্শন

চাঁদ দেখার গুরুত্ব

শরীয়তের দৃষ্টিতে নতুন চাঁদ দেখার বড় গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, মুসলিমদের ইবাদত ও কাজকর্ম চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। আর চান্দ্র মাসের সঠিক জ্ঞান নতুন চাঁদ দেখাকে গুরুত্ব না দিয়ে সম্ভব নয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ পুস্তিকা 'আল-হিলাল'এ চাঁদ দেখা ও তার গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা ক'রে লিখেছেন,

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ التِّسْعَةَ وَالْعِشْرِينَ يَجِبُ عَدَدُهَا وَاعْتِبَارُهَا بِكُلِّ حَالٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ.

উদ্দেশ্য এই যে, সর্বাবস্থায় সর্বকালে ২৯ গণনা ও গণ্য করা ওয়াজেব।[১৭]

বিশেষ ক'রে মুহার্রাম, শা'বান, রমযান ও যুল-হজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা উক্ত মাসগুলির সাথে ইসলামের কতিপয় রুক্ন সন্নিবেশিত আছে।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

يجب على الناس كفاية أن يلتمسوا هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان لأنه قد يكون ناقصا، نص عليه الشرنبلالي في " مراقي الفلاح ".

অর্থাৎ, শা'বানের ২৯ তারীখে রমযানের চাঁদ অনুসন্ধান করা লোকেদের জন্য ওয়াজেব কিফায়াহ। যেহেতু কখনো তা (মাস) অসম্পূর্ণ হয়। এ কথা শারানবালালী 'মারাক্বিউল ফালাহ'তে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[১৮]

---

(১৭) মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/১৫৩, বিশেষ আগ্রহী তালেবে ইল্মদের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন শায়খুল ইসলামের পুস্তিকা 'আল-হিলাল' অবশ্যই পড়েন।

(১৮) আল-ক্বাওলুল মানশূর ফী হিলালি খাইরিশ শুহূর ১৪৮পৃঃ, আরো দেখুন ঃ মারাক্বিউল ফালাহ ১২৬পৃঃ, শারহু ফাতহিল ক্বাদীর ২/৩১৩, এ ছাড়া অধিকাংশ ফুক্বাহা চাঁদ দেখাকে ফরযে কিফায়াহ বলেছেন। দেখুন ঃ আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ ১/৫৫১, বুহূষ ফিক্বহিয়্যাহ মুআস্বিরাহ ডঃ শরীফ ২২৩পৃঃ

হাদীসের আলোকে চন্দ্র দর্শন

নিম্নে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় হাদীসে চাঁদ দেখার গুরুত্ব স্পষ্ট হয় ঃ-

১। তিনি বলেছেন,

((أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ)).

অর্থাৎ, তোমরা রমযানের জন্য শা’বানের চাঁদকে গণনা কর।[১৯]

২। হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর আমল সম্বন্ধে বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা’বানের চাঁদ বা দিনকে স্মরণে রাখতে যতটা যত্ন নিতেন, ততটা অন্য কোন মাসের চাঁদ বা দিনকে স্মরণ রাখার জন্য যত্ন নিতেন না। অতঃপর রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। কিন্তু যদি (২৯ শা’বানের সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, তাহলে ৩০ দিন গণনা পুরো ক’রে নিতেন, তারপর রোযা রাখতেন।[২০]

অর্থাৎ, তিনি শা’বানের দিন গুনতেন, তা যত্নের সাথে মনে রাখতেন, যাতে রমযানের রোযা সঠিক তারীখে রাখা সম্ভব হয়। এমন না হয় যে, শা’বানের দিন গুনতে ভুল হয়ে যায়। আর তার ফলে রমযানের রোযা বিপন্ন হয়।[২১]

পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে,

১। চাঁদ দেখার বড় গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ ক’রে শা’বান ও রমযান মাসের চাঁদ।

২। শা’বানের চাঁদ ও দিন গনার ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া এ কথার প্রমাণ যে, অন্যান্য মাসের চাঁদ ও দিনের ব্যাপারে ততটা না হলেও স্বাভাবিক যত্ন নিতে হবে।

৩। প্রত্যেক মাসের চাঁদ ও তার প্রতি যত্ন নেওয়ার দলীল নিম্নে উল্লিখিত হাদীসসমূহে রয়েছে ঃ-

(১৯) তিরমিযী ৬৮৭, হাকেম ১৫৪৮, বাইহাক্বী ৮১৯৪, দারাকুত্বনী ২/ ১৬২, সিঃ সহীহাহ ৫৬৫নং

(২০) আবূ দাউদ ২৩২৭, ইবনে খুযাইমা ১৯১০, ইবনে হিব্বান ৮৬৯নং

(২১) মিরআতুল মাফাতীহ ৬/৪৫১

(ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে মাসের শুক্লপক্ষের শেষ তিন দিন অর্থাৎ, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যেমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, আমি তা আমরণ বর্জন করব না; (১) প্রতি মাসে তিনটি (১৩, ১৪, ১৫ তারীখে) রোযা রাখার। (২) চাশতের দু’ রাকআত (সুন্নত) পড়ার। (৩) এবং ঘুমাবার আগে বিত্‌র পড়ে নেওয়ার।’[২২]

একই অসিয়ত তিনি হযরত আবূ দারদা ﵁[২৩] ও হযরত আবূ যার্র ﵁-কে[২৪] করেছিলেন।

শুধুমাত্র উক্ত কয়েকজন সাহাবাই নয়, বরং সকল মুসলিমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশ ছিল। ক্বাতাদাহ বা কুদামাহ বিন মিলহান ﵁ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ « هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ ».

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুক্লপক্ষের শেষ ৩ দিন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা রাখতে আদেশ দিতেন এবং বলতেন, “এ হচ্ছে সারা বছর রোযা রাখার সমান।”[২৫]

এখন স্পষ্ট যে, যদি প্রত্যেক মাসে চাঁদ ও তার দেখার ব্যাপারে যত্ন না নেওয়া হয়, তাহলে ঐ তারীখগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ হবে কীভাবে? এই জন্য মহান আল্লাহর যে বান্দাগণ মহানবী ﷺ-এর উক্ত অসিয়ত অনুযায়ী আমল ক’রে থাকেন, তাঁরা প্রত্যেক মাসে চাঁদ দেখার ব্যাপারেও যত্নবান হন---যেমন লেখক কিছু শ্রদ্ধেয়জনকে লক্ষ্য করেছেন।

(২২) বুখারী ১১৭৮, মুসলিম ১৭০৫নং

(২৩) মুসলিম ১৭০৮, আবূ দাউদ ১৪৩৩নং, দেখুন সঃ তারগীব ১/৫৯৮

(২৪) আহমাদ ৫/ ১৭৩, নাসাঈ ২৪০৬নং, ইবনে খুযাইমা ৩/ ১৪৪

(২৫) আবূ দাউদ ২৪৫১, নাসাঈ ২৪৩২, ইবনে মাজাহ ১৭০৭নং, দেখুন সঃ তারগীব ১/৬০৩

(খ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন চাঁদ দেখলে এই দুআ বলতেন,

((اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ)).

"আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল-য়্যুমনি অল-ঈমা-নি অস্-সালা-মাতি অল-ইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। [২৬]

দুআর শব্দাবলী এবং ব্যাপকভাবে হাদীসের শব্দাবলী এ কথা বলছে যে, মহানবী ﷺ চাঁদ দেখার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। সেই সাথে এ কথাও জানা গেল যে, চাঁদ দেখা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম, যাতে যত্নবান হওয়া এবং তা দেখে দুআ পাঠ করা একটি শরয়ী আমল ও আল্লাহর প্রতি নৈকট্যদানকারী মাধ্যম। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(গ) মুসলিমদের জীবনের বহু সংখ্যক কর্ম চান্দ্র মাসের সাথে এমনভাবে সন্নিবেশিত আছে, যা চাঁদ দেখার ব্যাপারে যত্নবান না হলে তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা কঠিন। যেমন তালাকের ইদ্দত, বিধবার ইদ্দত, নযরের রোযা, কাফ্ফারার রোযা প্রভৃতি ওয়াজেব বিষয়াবলী, অনুরূপ আরাফার রোযা, আশূরার রোযা এবং অন্যান্য আরো নফল রোযা, ঈদুল আযহা এবং তাশরীকের দিনসমূহের নির্ধারণ, যে দিনগুলিতে রোযা রাখা হারাম।

এ সকল বিষয় ছাড়া মুসলিমদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রের চাঁদ দেখায় যত্নবান হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এই জন্য জরুরী যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দ্বীনের অন্যান্য বিষয়াবলীর মতো মুসলিমরা এ বিষয়েও অবহেলা ও ত্রুটির শিকার হয়েছে। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।

চাঁদ দেখার জন্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা যায় কি?

বর্তমান যুগে প্রত্যেক জিনিসের জন্য কিছু যন্ত্র ও মেশিন আবিষ্কার হয়েছে, যার ফলে মানুষের কাজকর্ম অনেক সহজ হয়ে গেছে। এ সকল যন্ত্র ও মেশিন কোন জিনিসের প্রকৃতত্বকে পরিবর্তন করে না, বরং তা অর্জনের ক্ষেত্রে

(২৬) আহমাদ ১/ ১৬২, তিরমিযী ৩৪৫১নং, হাকেম ৪/২৮৫

সহজতা এবং তাতে সৃষ্ট ত্রুটিকে সংশোধন ক'রে দেয়। অনুরূপ কিছু যন্ত্র এমন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা কিছু বিদ্যমান অদৃশ্য জিনিসকে মানুষের চোখে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে পেশ ক'রে থাকে। আর সেই সাথে সেই জিনিসের বিদ্যমানতাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। যেমন যদি কোন মানুষের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল থাকে, তাহলে তার জন্য চশমা আছে, যা দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি পূরণ ক'রে দেয়। এমনই যন্ত্ররাজির মধ্যে অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র অন্যতম। এর উপকারিতা এই যে, মানুষ যখন কোন জিনিসকে দেখতে চায়, তখন তার আকারকে বড় ক'রে প্রকাশ করে অথবা তাকে দর্শকের দৃষ্টির নিকটে ক'রে দেয়। যাতে মানুষ সহজে সেই জিনিস দেখতে পায়। এমন নয় যে, যন্ত্র কোন অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব প্রকাশ করে অথবা তার প্রকৃতত্বে কোন পরিবর্তন সাধন করে।

এই তত্ত্বকে সামনে রেখে এ কথা বলা যায় যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগের মানুষের জন্য, যারা সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতার শিকার হয়েছে এবং অন্যদিকে বড় বড় শহরের আশেপাশে উদয় ও অস্তাচল ধূলিময় তথা কল-কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ থাকে।

সঊদিয়ার আল-ক্বাসীমের আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল-উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এক প্রশ্নের উত্তরে চাঁদ দেখার জন্য দূরবীন ব্যবহার করাকে বৈধ ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "মাস প্রবেশের প্রমাণের জন্য শরয়ী পদ্ধতি এই যে, লোকেরা চাঁদ দেখবে। উচিত হল এ কাজের জন্য এমন লোক প্রস্তুত করা, যারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে এবং দৃষ্টির শক্তিশালিতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। সুতরাং যখন তারা চাঁদ দেখতে পাবে, তখন সেই মোতাবেক আমল আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, রমযানের চাঁদ হলে রোযা রাখা ওয়াজেব হবে। আর শওয়ালের চাঁদ হলে ঈদ করা ওয়াজেব হবে। পক্ষান্তরে (চাঁদ দেখার জন্য) দূরবীন ব্যবহার করার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাতে কোন সমস্যা নেই। তবে তা ব্যবহার করা ওয়াজেব নয়। যেহেতু হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে এ কথায় বোঝা যায় যে, কেবল দর্শনের উপর নির্ভর করতে হবে, তাছাড়া অন্য কোন কিছুর উপর নয়। কিন্তু যদি কোন নির্ভরযোগ্য লোক দূরবীন দ্বারা চাঁদ দেখে নেয়, তাহলে তার দেখা অনুযায়ী আমল করতে হবে। মোটকথা, যখনই কোন কিছু দ্বারা চোখের দেখা প্রমাণিত হবে, তখনই সেই

দর্শন অনুসারে আমল করতে হবে। যার দলীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তি,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)).

“যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, তখন ঈদ করবে। [২৭]

সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটিও একই ফতোয়া দিয়েছে। [২৮]

শরয়ী মাস প্রমাণের জন্য জ্যোতিষী হিসাবের উপর নির্ভরশীলতা

এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, শরীয়ত চান্দ্র মাস চেনার মাধ্যম হিসাবে চাঁদ দেখাকেই নির্ধারণ করেছে। এর দলীল হিসাবে কিছু হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এ কথাও পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, উম্মতের উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ প্রমাণ করার জন্য কেবল চাঁদ দেখাই নির্ভরযোগ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ

এখন এখানে একটি প্রশ্ন আসে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞান যখন এ কথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এত ঘন্টা এত মিনিটে চাঁদ পশ্চিমাকাশে দেখা যাবে (যেমন তাঁদের দাবী), তাহলে বিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্ব গ্রহণ করার মতো এ তত্ত্বকেও গ্রহণ ক'রে নেওয়া হয় না কেন এবং স্বচক্ষে চাঁদ দেখার পরিবর্তে হিসাবের উপর নির্ভর ক'রে রোযা ও ঈদের ফায়সালা নেওয়া হয় না কেন?

উত্তর ঃ

এ কথা শুধুমাত্র একটি অভিমত নয়। বরং বর্তমান যুগে এই অভিমতের উপর বড় জোর দেওয়া হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে অভিন্ন চন্দ্র দর্শনের অভিমতকে সামনে এনে তার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। উলামা সমাজে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে

([২৭]) বুখারী ১৯০০, মুসলিম ২৫৫৬নং, দেখুন ঃ মাজমূউ রাসায়েল ও ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উষাইমীন ১৯/৩৬-৩৭

([২৮]) ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ১০/৯৯

যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। [২৯]

বর্তমান যুগে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলে সুদক্ষ শামের হানাফী আলেম শায়খ মুস্তাফা আয্-যারক্বা' (রাহিমাহুল্লাহ)এর রায়ও অনুরূপ। [৩০] এই জন্য বিষয়টিকে কুরআন-হাদীসের দলীল এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামাগণের উক্তিসমূহের আলোকে সবিস্তার দেখা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

উম্মতের উলামাগণের মধ্যে অগ্রবর্তীগণ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীগণের কিছু উলামা তাতে মতভেদ করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং তাঁরা শরয়ী ও ঐতিহাসিকগত দিক থেকে এর ভিত্তি খুঁজে নিয়েছেন। অতঃপর আপনি সৌভাগ্যক্রমে বলুন অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে বলুন, তাঁদের মতলবের কিছু দলীল-প্রমাণও তাঁদের হস্তগত হয়েছে। এই জন্য তাঁদের দলীলসমূহের প্রতি তাহক্বীক্বী (সত্যানুসন্ধানী) দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে এ বিষয়টির ঐতিহাসিক অবস্থানের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। সুতরাং আমরা আলোচনাটিকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে নিই ঃ-

প্রথম আলোচনা ঃ প্রসিদ্ধ আহলে ইল্ম, যাঁদের প্রতি এ বিষয়কে সম্পৃক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ তাঁদের দলীলসমূহের পর্যালোচনা।

প্রথম আলোচনা ঃ

এ বিষয়ে লিখিত বই-পুস্তকের উপর নজর দেওয়ার পর প্রসিদ্ধ উলামাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় ব্যক্তির নাম আসে ঃ-

১। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ্-শিখ্খীর

২। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ্-শাফেয়ী

৩। ফক্বীহ মুহাম্মাদ বিন মুক্বাতিল হানাফী আর-রাযী

([২৯]) আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন, أوائل الشهور العربية، هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي؟

([৩০]) জনাবের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ দেখুন ঃ মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামীতে ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড ৯৩২পৃঃ

৪। আবুল আব্বাস আহমাদ বিন উমার বিন সুরাইজ আশ্-শাফেয়ী
৫। আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ আদ্-দীনাঅরী
৬। তাক্বিউদ্দীন আলী বিন আব্দুল কাফী আস্-সুবকী
৭। আল্লামাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাকের (রাহিমাহুমুল্লাহু জামীআ)

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আরো অনেকের নাম পেশ করা যায়। কিন্তু যেহেতু সাধারণভাবে অথবা নিজ নিজ ময়দানে উক্ত ব্যক্তিগণের বিশেষ প্রভাব আছে, এই জন্য কেবল ঐ নামগুলিই যথেষ্ট মনে করা হল।

পূর্বোক্ত নামাবলীর যে তালিকা পেশ করা হল, তাতে প্রকৃততত্ব কতটা আছে, তার অনুমান নিম্নের পঙ্‌ক্তিসমূহে সহজে করা যাবে।

মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ্-শিখ্খীর (রাহিমাহুল্লাহ) [৩১]

হযরত মুত্বার্রিফ (রাহিমাহুল্লাহ)র নাম হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র তাঁর গ্রন্থ 'আত্-তামহীদ' ও 'আল-ইস্তিযকার'-এ, হাফেয আল-ইরাক্বী তাঁর গ্রন্থ 'ত্বারহুত তাষরীব'-এ এবং হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'তে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সকলেই এ কথা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন যে, যদি উনত্রিশের সন্ধ্যায় অস্তাচল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে পঞ্জিকা ও চন্দ্র-তিথির হিসাব অনুসারে রোযা রাখা যেতে পারে। [৩২]

এখানে একটি কথা স্পষ্ট থাকা ভালো যে, যে উলামাগণই এ কথার সম্পর্ক মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহর সাথে জুড়েছেন, তাঁদের সকলের রুজুস্থল হলেন হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র। অথচ হাফেয ইবনে আব্দিল বার্রের কিতাবসমূহের দিকে রুজু করার পরে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যাবে না যে,

[৩১] মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ্-শিখ্খীর (রাহিমাহুল্লাহ) বড় বড় তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আশ্-শিখ্খীর ﵁-এর পুত্র। ইমাম যাহাবী তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন, "প্রমাণ-প্রতিম আদর্শ ইমাম।" পরন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার, তাঁর দুআ কবুল হত এবং তাঁর মাধ্যমে কারামত প্রদর্শিত হয়েছে। সন ৯৫ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি হাদীসে নির্ভরযোগ্য, আবেদ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।' কুতুবে সিত্তার একজন বর্ণনাকারী তিনি। দেখুন ঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/ ১৮৭, তাক্বরীবুত তাহযীব ৯৪৮পৃঃ)

[৩২] তামহীদ ১৪/৩৫২, ইস্তিযকার ১০/ ১৮, ফাতহুল বারী ৪/ ১২২, ত্বারহুত তাষরীব ৪/ ১১২

বাস্তবেই মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহর প্রতি এ উক্তির সম্পর্ক জুড়া সঠিক। কেননা, হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

قيل: إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، والله أعلم.

"বলা হয়েছে যে, তিনি মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আশ্-শিখ্খীর। আর আল্লাহই অধিক জানেন। [৩৩]

'আত্-তামহীদ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লম্বা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام ((صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِين)). ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير، وليس بصحيح عنه، والله أعلم. ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له.

"(যদি উনত্রিশের সন্ধ্যায় অস্তাচল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে পঞ্জিকা ও চন্দ্র-তিথির হিসাব অনুসারে রোযা রাখা যেতে পারে) এ হল এমন একটি মত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত হাদীসসমূহের কারণে প্রাচীনকালের ও বর্তমানের উলামাগণ বর্জন করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, "চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ কর। অতঃপর তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (মাস) ত্রিশ পূর্ণ করে নাও।" আর আমার জানা মতে মুসলিমদের কোন ফক্বীহ এ ব্যাপারকে তিথি-হিসাবের উপর ভিত্তি করেননি। এ ব্যাপারে যা বর্ণিত, তা হল মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহর উক্তি। অথচ তা তাঁর নিকট থেকে (বর্ণনা) শুদ্ধ নয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন। যদিও তা শুদ্ধ হতো, তবুও তার উপর আমল ওয়াজেব হতো না। যেহেতু তা বিরল উক্তি এবং দলীল তার প্রতিকূল। [৩৪]

হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লা)ও হাফেয ইবনে আব্দিল

[৩৩] ইস্তিযকার ১০/ ১৮
[৩৪] তামহীদ ১৪/৩৫২

বার্রের উক্ত উক্তিই উদ্ধৃত করেছেন।[৩৫]

হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র ও হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুমাল্লাহ)এর বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ করার ভিত্তির ব্যাপারটা হযরত মুত্বার্‌রিফ বিন আব্দুল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা দুইভাবে সঠিক নয় ঃ-

এক ঃ তাঁর প্রতি এ কথার সম্পর্ক শুদ্ধ (প্রমাণিত) নয়। আর এখান হতেই সেই সব লেখকদের ভুল ও ত্রুটির কথা অনুমান করা যায়, যাঁরা এ কথার সম্পর্ক হযরত মুত্বার্‌রিফ বিন আব্দুল্লাহর সাথে নিশ্চিত বাক্যে জুড়ে থাকেন।

দুই ঃ উক্ত কথার সম্পর্ক হযরত মুত্বার্‌রিফের সাথে জুড়া সঠিক বলে মেনে নিলেও চাঁদের তিথি হিসাবের উপর ভিত্তি করে রোযা-ঈদ কেবল একটি অবস্থায় হতে পারে, যখন চাঁদের উদয়স্থল মেঘলা থাকে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্‌গণ এ কথার নিশ্চয়তা দেন যে, যদি মেঘ না থাকত, তাহলে অবশ্যই চাঁদ দেখা যেত।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ্‌-শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)

এ মতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন, ইমাম শাফেয়ী। সুতরাং তাঁর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি চন্দ্র-তিথি ও নক্ষত্র জ্ঞানের মাধ্যমে চাঁদের উদয়-অস্তের অভিজ্ঞতা রাখে এবং সে তার মাধ্যমে এ কথা জেনে নেয় যে, আজ চাঁদ অবশ্যই দেখা যাবে, কিন্তু চাঁদ দেখার সময়ে উদয়স্থলে মেঘ ছেয়ে গেল, তাহলে তার জন্য বৈধ, সে রোযার নিয়ত করবে। এ রোযা তার জন্য যথেষ্ট হবে, অর্থাৎ তার ফরয আদায় হয়ে যাবে।[৩৬]

এখানে দুটি কথা অনুধাবনযোগ্য ঃ-

এক ঃ এ কথা ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)র কোন কিতাবে[৩৭] মজুদ নেই। তাঁর কোন উপযুক্ত ছাত্রও তা বর্ণনা করেননি। আর না এ কথা ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ)র ইল্‌মী-পদ্ধতির অনুকূল। বিশেষ ক'রে যদি কোন ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কিতাব 'আর-রিসালাহ' পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি এ কথা

(৩৫) ফাতহুল বারী ৪/ ১৫৭

(৩৬) তামহীদ ১৪/৩৫২-৩৫৩

(৩৭) যেমন ঃ আল-উম্ম, আহকামুল ক্বুরআন, আল-মুসনাদ, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীষ ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন যে, উক্ত মত ইমাম সাহেবের নয়। এ ছাড়া উক্ত কথাকে ইমাম শাফেয়ীর প্রতি সম্পৃক্ত করাকে একাধিক ইমাম ভুল বলে আখ্যায়ন করেছেন। যেমন ইমাম ইবনে আব্দিল বার্র, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাক্বী এবং আল্লামাহ আবূ বাক্‌র আল-আরাবী (রাহিমাহুমুল্লাহু জামীআ)।[৩৮]

দুই ঃ সেই কথাই, যা হযরত মুত্বার্‌রিফ (রাহিমাহুল্লাহ)র ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাই বলা যাবে যে, (রোযা-ঈদ করার) এই অনুমতি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য হবে, যে চন্দ্র-তিথির হিসাবে দক্ষ এবং সেই অবস্থায় হবে, যখন চাঁদের দর্শনস্থল মেঘাচ্ছন্ন বা ধূলিময় থাকার কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না।

ফক্বীহ মুহাম্মাদ বিন মুক্বাতিল হানাফী আর-রাযী[৩৯]

ফিক্বহের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত, মুহাম্মাদ বিন মুক্বাতিল রাযীর মত ছিল, যদি একাধিক জ্যোতিষী এ কথার সমর্থন করত যে, আজ চাঁদ নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে, তাহলে তিনি তাদের কথার উপর ভিত্তি (ক'রে রোযা-ঈদ) করতেন।

কিন্তু প্রথমতঃ তাঁর জীবদ্দশা থেকে জানা যায় যে, হাদীস ও ফিক্বহে তিনি এমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, যার ফলে তাঁর বিরোধিতা উম্মতের ঐকমত্যে কোন প্রভাব পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ খোদ হানাফী মযহাবের একাধিক উলামা; যেমন ইমাম সারাখসী প্রমুখ তাঁর এ মতের খন্ডন করেছেন।[৪০]

আবুল আব্বাস আহমাদ বিন সুরাইজ আশ্‌-শাফেয়ী[৪১]

(৩৮) তামহীদ ১৪/৩৫৩, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/ ১৮২, ত্বারহুত তাষরীব ৪/ ১১২, আ-রিযাতুল আহওয়াযী ৩/৩০৭ প্রভৃতি

(৩৯) ইনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানীর ছাত্র। ইমাম অকী' প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসীনগণ তাঁকে 'যয়ীফ' বলেছেন। ফিক্বহে তাঁর বড় মর্যাদা ছিল। দেখুন ঃ আল-জাওয়াহিরুল মুয়ীআহ ৩/৩৭২, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৭, তাক্বরীবুত তাহযীব ৮৯৮, কাশফুল আসতার ৯৬পৃঃ

(৪০) দেখুন ঃ আল-মাবসূত্ব ৩/ ৭৮, আল-আশবাহ অন-নাযায়ের ২০০, তানবীহুল গাফেল ৯৬পৃঃ

(৪১) ইনি সমসাময়িক কালের একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র মুযানীর নিকট ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন এবং তাতে তিনি এমন মর্যাদায় পৌঁছে ছিলেন যে, তাঁকে তৃতীয়

যে সকল উলামার দিকে উক্ত কথার সম্পর্ক জুড়া সঠিক বলে মানা যায়, তাঁদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ)। এ কারণেই আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর নাম বড় দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। (৪২)

কিন্তু কিছু কথা লক্ষণীয় ঃ-

১। ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ)র লিখিত কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে বর্তমান নেই। ফিক্বহের কিতাবসমূহে তাঁর একটি ব্যাপকার্থবোধক উক্তি আছে। তার ব্যাখ্যা করা এবং তা হতে মাসআলা গ্রহণ করার ব্যাপারে শাফেয়ী ফুক্বাহাদের মতভেদ আছে। ইমাম নাওয়াবী, হাফেয ইবনে হাজার এবং হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাক্বী (রাহিমাহুমুল্লাহ) শাফেয়ী ইমামগণের পাঁচটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন; যা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) উদয়স্থল পরিষ্কার না হওয়ার কারণে রমযানের চাঁদ দেখা না গেলে চান্দ্র-হিসাব ও তিথি-বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে রোযা রাখা বৈধ। কিন্তু এ রোযা ফরযের স্থলাভিষিক্ত হবে না।

(খ) রোযা রাখা বৈধ হবে এবং তাতে ফরযও আদায় হয়ে যাবে।

(গ) সঠিক হিসাব-বিজ্ঞদের জন্য এমন দিনে রোযা রাখা বৈধ হবে। অন্যদের জন্য শুদ্ধ হবে না।

(ঘ) গ্রহবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদের জন্য রোযা রাখা বৈধ হবে এবং অন্যদের জন্য বৈধ হবে না।

(ঙ) নক্ষত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদের জন্য রোযা রাখা বৈধ হবে এবং অন্যদের জন্যও বৈধ হবে। (৪৩)

২। ইমাম ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ)র ইল্‌ম ও পরহেযগারী নিজের জায়গায় স্বীকৃত এবং তাঁর ফিক্বহী দক্ষতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু এ কথাও

শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' (দ্বীন সংস্কারক) বলা হয়েছে। ৩০৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। বলা হয় যে, তিনি প্রায় ৪০০ কিতাবের প্রণেতা ছিলেন। দেখুন ঃ আল-ওয়াফী বিল-অফিয়াত ৭/২৬০, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১৪/২১০, আল-ই'লাম, যারকালী ১/১৮৫

(৪২) দেখুন ঃ রিসালাতু আওয়ায়িলিশ শুহূর ১৫পৃঃ

(৪৩) আল-মাজমূ' ৬/২৩৫, ফাতহুল বারী ৪/১২৩, ত্বারহুত তাষরীব ৪/১১২-১১৩, আল-আলামুল মানশূর, সুবকী ৩০-৩২পৃঃ

লক্ষণীয় যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্তি ইমাম ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ)র কাছে কীভাবে পৌঁছল? কেননা, ইবনে সুরাইজ নিজ কথার বুনিয়াদ ইমাম শাফেয়ীরই কথার উপর স্থাপন করেছেন।

৩। ইবনে সুরাইজের প্রতি সম্পৃক্ত কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, জ্যোতিষ-হিসাবের উপর ভিত্তি ক'রে রোযা রাখা বৈধ, তবে তাতে কিছু শর্ত আছে ঃ-

(ক) জ্যোতিষ-হিসাবের উপর ভিত্তি ক'রে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, চাঁদ উদয় হয়েছে।

(খ) উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না।

(গ) কেবল চাঁদের হিসাবজ্ঞদের জন্যই হিসাবের উপর আমল করা বৈধ, অন্যদের জন্য নয়।

৪। এমন মনে হয় যে, ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) এ কথা নিজ ইমামের তাক্বলীদ (অন্ধানুকরণ) ক'রেই বলেছেন। আর সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভক্তি ও অন্ধানুকরণের শিকার হয়ে কোন কথার সমর্থন এবং নিজ শ্রদ্ধেয়ভাজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়ে যায়। অথচ তার উদ্দেশ্য বাতিলের সপক্ষে প্রতিবাদ করা থাকে না। এই জন্য খুব সম্ভবতঃ ইমাম আবুল আব্বাস (রাহিমাহুল্লাহ) পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)র প্রতি সম্পৃক্ত ঐ উক্তি কারো মাধ্যমে পৌঁছেছে এবং তিনি নিজ ইমামের অন্ধানুকরণ ও ভক্তিবশতঃ তা গ্রহণ ও প্রচার করতে অনন্যোপায় ছিলেন।

সুতরাং যখন এ কথা প্রমাণিত যে, উক্ত অভিমত ইমাম শাফেয়ীর নয়, তখন দলীল গ্রহণের সকল ভিত্তিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (৪৪) আর আল্লাহই অধিক জানেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন ক্বুতাইবাহ (রাহিমাহুল্লাহ)(৪৫)

(৪৪) দেখুন ঃ ফিক্বহুন নাওয়াযিল ২/২০৪

(৪৫) ইনি ইবনে ক্বুতাইবাহ আদ-দীনাওরী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি কট্টর সালাফী মেজাজের ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে 'খাত্বীবু আহলিস সুন্নাহ' উপাধি দান করেছেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থপ্রণেতা। ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহের মযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ২৭৬ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। ইমাম যাহাবী তাঁকে

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় পঞ্জিকা বা জ্যোতিষ হিসাবের উপর নির্ভর করার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কুতাইবার নাম হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ ইবনে কুতাইবার সাথে এ অভিমতের সম্পর্ক জুড়ার ব্যাপারে লেখকের সন্দেহ আছে।[৪৬] দ্বিতীয়তঃ হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) আল্লামা ইবনে কুতাইবার উক্ত অভিমত উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, 'এটা ইবনে কুতাইবার বিষয় নয় এবং এই শ্রেণীর মাসায়েলে তাঁর উপর নির্ভর করা যাবে, তাও সঠিক নয়।[৪৭] হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ)ও ইবনে আব্দিল বার্রের উক্ত বাক্য উদ্ধৃত করে তাঁর সহমত প্রকাশ করেছেন।[৪৮]

ইমাম তাক্বিয়্যুদ্দীন সুবকী শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)

এ ব্যাপারে ইমাম সুবকী (রাহিমাহুল্লাহ)র নাম উল্লেখ করা হয় এবং তাঁর অভিমতও প্রায় তাই, যা ইবনে সুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) সম্বন্ধে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর কিতাব 'আল-আলামুল মানশূর'-এ উক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

فأنا اختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لا في الوجوب، وشرط اختياري للجواز حيث ينكشف من علم الحساب انكشافًا جليًا مكانه، ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم.

"এ ব্যাপারে আমি ইবনে সুরাইজ ও তাঁর মতানুসারীদের অভিমত

'আল-আল্লামাতুল কাবীর যুল-ফুনূন' বলে আখ্যায়ন করেছেন। দেখুন ঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/২৯৬, অফিয়াতুল আ'য়ান ৩/৪২-৪৩

([৪৬]) সন্দেহ এই জন্য আছে যে, উক্ত আল্লামার একাধিক কিতাবের প্রতি রুজূ করার পরেও তাতে তাঁর এ অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আর হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর এ অভিমত উদ্ধৃতও করেননি। শুরুতে আমার সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে, আল্লামার উক্ত অভিমত তাঁর 'গারীবুল হাদীষ' নামক গ্রন্থে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু অগভীর অনুসন্ধানের পরেও উক্ত (চাঁদ দেখার) হাদীস 'কিতাবুস স্বিয়াম' এবং 'আহাদীসু ইবনে উমার'-এ পাওয়া যায়নি। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

([৪৭]) তামহীদ ১৪/৩৫২

([৪৮]) ফাতহুল বারী ৪/ ১৩৩

এখতিয়ার করছি, বিশেষ ক'রে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে, ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে নয়। আর জায়েয হওয়াকে এখতিয়ার করার আমার শর্ত হল এই যে, হিসাবশাস্ত্রের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, চাঁদ অবশ্যই দেখা যাবে। আর এ জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্রের দক্ষ পন্ডিত ছাড়া আর কারো অর্জন হয় না।"[৪৯]

আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)[৫০]

আমার নিকট পরবর্তীদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যেহেতু আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীস, ফিক্বহ, বরং সকল প্রকার শরয়ী ইল্ম ও ভাষা-বিদ্যায় সুপন্ডিত। আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) ১৩৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং তাতে তিনি ৩টি কথার উপর জোর দেন ঃ-

১। চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ নির্ণয় করার ব্যাপারে বর্তমানে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করা বৈধ নয়।

২। সারা বিশ্বকে ইসলামী প্রাণকেন্দ্র মক্কা মুকার্রামার চাঁদ দেখার অনুগামী হতে হবে।

([৪৯]) আল-আলামুল মানশূর ২২পৃঃ, পরবর্তীদের এক মিসরী হানাফী আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বিন বাখাইত আল-মুত্বীয়ীরও রায় একই। দেখুন ঃ তাঁর পুস্তিকা 'ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ' ২৫৭-২৫৮পৃঃ, অনুরূপ তাঁর ছাত্র আহমাদ আল-গাম্মারী আল-মাগরিবীও এই রায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি এ প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'তাওজীহুল আনযার' দেখুন ঃ ৫২-৫৩পৃঃ

([৫০]) ইনি ১৩০৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পিতা আল্লামা মুহাম্মাদ শাকেরের স্নেহ-ছায়াতে থেকে দ্বীনী ও পার্থিব তরবিয়ত অর্জন ক'রে এমন এক মর্যাদায় উন্নীত হন যে, লোকে তাঁর পিতাকে ভুলে যান। আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ, সাহিত্য, বরং প্রত্যেক বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন। আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যাতে তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল, যেমন তাঁর রচনা ও তাহক্বীক্ব-লেখনীতে প্রকাশ। মহান আল্লাহ আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)কে বিস্ময়কর দুঃসাহসিকতা দান করেছিলেন। সমসাময়িক কালে অন্ধ তাক্বলীদ ও মযহাবী ঘনীভূত অবস্থার উপর গভীর আঘাত হেনেছিলেন। ৩০ বছর অপেক্ষা বেশি সময় ধরে বিচারক পদে বহাল ছিলেন। ১৩৭৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। (দেখুন ঃ তাঁর ভাই মাহমূদ শাকেরের লিখিত 'কালিমাতুল হাক্ব'এর ভূমিকা।

৩। সারা বিশ্বকে একই দিনে রোযা, ঈদ ও আরাফা পালন করতে হবে।

আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র প্রথম কথার সারসংক্ষেপ এই যে, এ উম্মত থেকে নিরক্ষরতার গুণ দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে কেবল হিসাবের প্রতি রুজু করা ওয়াজেব। চাক্ষুষ চাঁদ দেখার মাসআলাকে দূরে রেখে মাসের প্রথম তারীখ সেটাই গণ্য করা উচিত, যে তারীখে চাঁদ সূর্যের পর অস্ত যাবে; যদিও তা ক্ষণিকের পর হয়।[৫১]

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে চাঁদ দেখার মসলা তথা চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ নির্ণয়ের ব্যাপারে পঞ্জিকা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের উপর নির্ভরতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা পেশ করেছি। যার মাধ্যমে জানা যায় যে, যে সকল যশস্বী উলামাদের প্রতি উক্ত অভিমত সম্পৃক্ত করা হয়, তাঁদের প্রতি এ সম্পর্ক জুড়াটা স্বস্তিমূলক নয়। যে সকল শর্তের সাথে পূর্বোক্ত উলামাগণ (পঞ্জিকার উপর নির্ভর ক'রে রোযা-ঈদ করার) অনুমতি দিয়েছেন, তাতে ব্যাপক অনুমতি প্রমাণ হয় না। বরং ব্যক্তিগতভাবে আমলের অনুমতি আছে। অবশ্য বর্তমান যুগে এমন লোক জন্ম নিয়েছেন, যাঁরা বলেন, যখন হিসাবজ্ঞ ও চাঁদের তিথিজ্ঞানসম্পন্ন লোকের জন্ম হয়েছে, তখন হিসাব ও পঞ্জিকার মাধ্যমেই মাসের শুরু ও শেষ নির্ণয় করা উচিত। এই জন্য সম্ভবতঃ আমি এ কথা বললে হক বলব যে, এটা বর্তমান যুগের একটি বিদআত, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)রও কলম এখানে হোঁচট খেয়েছে।[৫২]

---

(৫১) আওয়ায়িলুশ শুহূর ১৪পৃঃ

(৫২) আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র প্রতি লক্ষ লক্ষ করুণা বর্ষিত হোক, জানি না তিনি কোন মানসিকতা নিয়ে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। তাঁর মতো সালাফী ও আষারী আলেম দ্বারা এমন অপব্যাখ্যা প্রচার হওয়া বিশ্বের আশ্চর্যসমূহের অন্যতম। সত্য কথা যে, লেখক যখন তাঁর এই পুস্তিকাটি পাঠ করল, তখন নিজের সাথী-সঙ্গীদের বলতে লাগল, যদি আমি আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র লেখা এবং তার রচনাশৈলী সম্বন্ধে অবগত না হতাম, তাহলে আমি বলতাম যে, এ লেখা তাঁর নয়। কিন্তু প্রবাদ সত্য যে, لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة অর্থাৎ, প্রত্যেক ভালো ঘোড়াও মুখ থুবড়ে পড়ে এবং প্রত্যেক আলেম দ্বারাও বিচ্যুতি ঘটে। পরে জানতে পারলাম এই আশ্চর্য ও অবাক হওয়াতে কেবল লেখক একা নয়, বরং আমার পূর্বেও অন্য কিছু উলামা অবাক হয়েছেন। সুতরাং শায়খ ইসমাঈল আনসারী আল্লামা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

وَقَدّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ . وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ ؛ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ الحادثين بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إذَا غُمَّ

আহমাদ শাকেরের প্রতিবাদে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন, لو غيرك قالها يا أستاذ অর্থাৎ, 'উস্তায! যদি এ কথা আপনি ছাড়া অন্য কেউ বলত'।

প্রসিদ্ধ তত্ত্বানুসন্ধানী আলেম আল্লামা বাক্‌র আবূ যায়দ (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, শায়খ ইসমাঈল আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ)র কাছে আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)র একটি চিঠি আমার হস্তগত হল। যাতে তিনি নিজের লেখার জন্য ভুল স্বীকার করেছেন এবং স্পষ্ট লিখেছেন, 'আমি এই অভিমতে সন্তুষ্ট নই। বরং এ বিষয়টিকে উত্থাপন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।' (ফিক্বহুন নাওয়াযিল ২/২০৪)

আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্ত চিঠি থেকে এ কথা জানা যায় যে, তাঁর নিজের রায়ের উপর তিনি সন্তুষ্ট নন এবং এখন তিনি সেই রায় থেকে রুজু করছেন।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্ত পুস্তিকাটি ১৩৫৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল; অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের প্রায় ২০ বছর পূর্বে। অতঃপর তিনি পৃথক বই-পুস্তক রচনায় ব্যস্ত থাকেন। তাতে উক্ত বিষয়টিকে উত্থাপন করার একাধিকবার সুযোগ হাতে এসেছে, কিন্তু তিনি একেবারেই নীরব থেকেছেন। বিশেষ ক'রে মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যা, যার প্রথম খন্ডের ভূমিকা ১৩৬৫ হিজরীতে লেখা হয়েছে এবং মুসনাদে এমন অনেক হাদীস তাঁর নজরে পড়েছে, যা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তিনি কোন হাদীসের উপর কোন টীকা লিখেননি। এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর সেই হাদীসও তাঁর নজরে পড়েছে, যে হাদীসকে উলামাগণ দেশভিত্তিক চাঁদ দেখার উপর নির্ভর ক'রে রোযা-ঈদ করার দলীলরূপে পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনা ক'রে পার হয়ে গেছেন এবং একটি শব্দও লিখেননি। (দেখুনঃ ৪ খন্ড ২৮২পৃঃ) অথচ নিজের অভিমত ব্যক্ত করার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল; যেমন এই শ্রেণীর জায়গাতে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করার অভ্যাস রয়েছে। পরন্তু লক্ষ্য করুন, যে বিস্তারিত বিষয়-সূচী তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক খন্ডের শেষের দিকে স্থাপন করেছেন এবং যার জন্য তিনি মুসনাদের আসল কাজ শুরু করেছিলেন, সেখানে হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন,

رؤية الهلال ولكل أهل بلد رؤيتهم

অর্থাৎ, চাঁদ দেখা এবং প্রত্যেক দেশবাসীর নিজ নিজ দর্শন (অনুযায়ী রোযা-ঈদ)। *(৪/৩৮১)*

এ সকল কথা এই প্রকৃতত্ত্বকে শক্তিশালী করে যে, আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ রায় প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। অল-হামদু লিল্লাহ।

الْهِلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ فَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ دَلَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ صَامَ وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِغْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ . فَأَمَّا اتِّبَاعُ ذَلِكَ فِي الصَّحْوِ أَوْ تَعْلِيقُ عُمُومِ الْحُكْمِ الْعَامِّ بِهِ فَمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ.

অর্থাৎ, (মাসের শুরু ও শেষ কেবল চাঁদ দেখার ভিত্তিতে হবে) এ কথার উপর মুসলিমরা একমত। আসলেই এ ব্যাপারে না কোন পুরনো মতভেদ জানা যায়, না কোন নতুন মতভেদ। হ্যাঁ, তৃতীয় শতাব্দীর পর কিছু অভিনব ফুক্বাহাতুল্য ব্যক্তির এ ধারণা ছিল যে, (উনত্রিশের সন্ধ্যায়) অস্তাচল মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদের হিসাবজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বৈধ, সে নিজের হিসাব অনুযায়ী নিজে আমল করবে।[৫৩] সুতরাং হিসাব যদি বলে যে, (আকাশ পরিষ্কার থাকলে চাঁদ অবশ্যই) দেখা যেত, তাহলে সে রোযা রাখবে; নচেৎ না। আর এ অভিমত যদিও আকাশ মেঘলা থাকার শর্তসাপেক্ষ এবং হিসাব-জান্তার জন্য খাস, তবুও তা বিরল এবং তার বিপরীত অভিমতের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠালাভের পরের কথা। পক্ষান্তরে আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় তা মেনে নেওয়া অথবা তাকে ব্যাপক নির্দেশরূপে নির্ধারণ করার কথা কোন মুসলিম বলেনি।[৫৪]

হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে সুরাইজের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, "ইবনুস স্বাব্বাগ (আব্দুস সাইয়িদ বিন মুহাম্মাদ) বলেছেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের ভিত্তিতে রোযা রাখা মোটেই ওয়াজেব হবে না। আমাদের মযহাবের উলামাগণ এ বিষয়ে একমত।' (হাফেয ইবনে হাজার বলেন,) আমি বলি, 'ইবনুল মুনযির স্বীয় কিতাব আল-ইশরাফে এ কথার উপর উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) উদ্ধৃত করেছেন যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে ৩০ তম দিনে রোযা

(৫৩) কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, হিসাবজ্ঞদের কথা আকাশ মেঘলা থাকা অবস্থায় গ্রহণযোগ্য এবং পরিষ্কার থাকা অবস্থায় নয়---এই পার্থক্যের কুরআন ও হাদীসভিত্তিক দলীল কোথায়? পরন্তু "যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ ক'রে নাও" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর অর্থ কী? অথচ এ হাদীস কেবল হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থে প্রায় ছয়জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন ঃ জামেউল উসূল ৬/২৬০ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠা)

(৫৪) মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/ ১৩২-১৩৩

রাখা ওয়াজেব নয়। বরং অনেক সাহাবায়ে কিরাম ﷺ তাকে মকরূহ বলেছেন। স্পষ্ট থাকে যে, ইবনুল মুনযির জ্যোতিষ-হিসাবে অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মাঝে কোন পার্থক্য উল্লেখ করেননি। সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়ের মাঝে পার্থক্য ব্যক্ত করবে, তার বিরুদ্ধে হুজ্জত হবে ইজমা।"[৫৫]

উক্ত দুই ইমামের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চান্দ্র মাস প্রমাণ করার জন্য চন্দ্র দর্শন হল শর্ত। নচেৎ ৩০ দিনের গুনতি পূরণ করা জরুরী। এই অভিমতই সালাফ ও খালাফের উলামাগণের। যদি পরবর্তীতে কিছু লোক এই 'ইজমা' থেকে বের হয়ে মতভেদ করেছে, তাহলে তাও খুব সীমাবদ্ধ বৃত্তে। এর ফলে উম্মতের ইজমা প্রভাবিত অবশ্যই হয়, কিন্তু তার প্রামাণিক-যোগ্যতা শেষ হয়ে যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই সঊদী আরবের স্থায়ী উলামা-কমিটি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্ত অভিমতকে সমর্থন করেছেন।[৫৬] প্রসিদ্ধ সত্যানুসন্ধানী আলেম শায়খ বাক্‌র বিন আবূ যায়দ (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ রচনা করেছেন। যা প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীর জন্য অসীম উপকারী।[৫৭]

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ
দলীলসমূহ নিয়ে সমীক্ষা

চাঁদ দেখার বদলে জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার হিসাবকে ভিত্তি ক'রে রোযা-ঈদ সম্পাদনকারীদের কিছু বর্ণিত দলীল ও যুক্তি আছে। নিম্নে তাঁদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বর্ণিত দলীল উল্লেখ করা হচ্ছে। অবশ্য বিবেকপ্রসূত যুক্তিসমূহ উল্লেখ করার সুযোগ এখানে নেই। কেননা বিবেকপ্রসূত যুক্তিসমূহের বিচার করার মানেই হল পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করা। বিস্তারিত জানতে আগ্রহী সুধীমন্ডলী মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড এবং আবহাযু কিবারিল উলামার ৩য় খন্ড দেখতে পারেন।

প্রথম দলীল ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(৫৫) ফাতহুল বারী ৪/ ১৫৭-১৫৮ দারুস সালাম ছাপা, বিস্তারিত দেখুন ঃ আবহাযু হাইয়াতি কিবারিল উলামা ৩/৩০

(৫৬) পূর্বোক্ত 'আবহায' দেখুন।

(৫৭) ফিক্বহুন নাওয়াযিল ২/ ১৮৯ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

অর্থাৎ, যখন তোমরা চাঁদ দেখ, তখন রোযা (শুরু) কর এবং (২৯ তারীখে) যখন তোমরা চাঁদ দেখ, তখন রোযা ছাড়। অতঃপর যদি (২৯ তারীখের সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে তার অনুমান কর।[৫৮]

দলীল গ্রহণ করার কারণ এই যে, উক্ত হাদীসে নববী নির্দেশ রয়েছে যে, "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তার অনুমান কর।" আর অন্য হাদীসে আছে, "গুনতি ৩০ পূরণ ক'রে নাও।" সাধারণতঃ উলামাগণ দ্বিতীয় বর্ণনাকে প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যা মনে করেন। কিন্তু হিসাবপন্থী হযরতদের বক্তব্য হল, হাদীসের দুই শব্দে দুই শ্রেণীর মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেখানে নবী ﷺ অনুমান করার কথা বলেছেন, সেখানে তাঁর সম্বোধন তাদের প্রতি করা হয়েছে, যারা চাঁদের হিসাব-নিকাশ জানে। অর্থাৎ, তাদেরকে বলা হয়েছে যে, চাঁদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা চান্দ্র-তিথির হিসাবকে কাজে লাগাও। অতঃপর যদি সেই হিসাবে প্রমাণিত হয় যে, আজ চাঁদ প্রকাশ হওয়া উচিত, তাহলে কাল রোযা রাখো বা ঈদ কর। পক্ষান্তরে হিসাবে যদি এ কথা জানা যায় যে, মাস ত্রিশ দিনের, তাহলে কাল রোযা রেখো না বা ঈদ করো না। আর "গুনতি ৩০ পুরো ক'রে নাও" নবী ﷺ-এর এ কথার সম্বোধন সাধারণ মানুষকে করা হয়েছে, যারা জ্যোতিষ বা চাঁদের তিথি-হিসাব ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদেরকে বলা হয়েছে, উনত্রিশের সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে---যেহেতু তোমরা চান্দ্র-তিথির হিসাব জানো না, সেহেতু---ত্রিশ সংখ্যার গুনতি পূরণ ক'রে নাও।

উক্ত সুধীমন্ডলীর অতিরিক্ত বক্তব্য এই যে, যেহেতু উম্মতে হিসাবজ্ঞ শিক্ষিত লোক বর্তমান রয়েছে এবং চাঁদের খবর বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছানো যায়, সেহেতু দর্শনের উপর নির্ভরশীলতা কেবল সেই ছোট জামাআতের জন্য বিধেয় হবে, যাদের নিকট মাস শুরু হওয়ার খবর পৌঁছানো সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে যাদের নিকট চাঁদের খবর অতি সহজে পৌঁছে যাবে, তাদের উচিত ঐ হিসাব-জানা লোকেদের কথায় নির্ভর করা।[৫৯]

(৫৮) বুখারী ১৯০০, মুসলিম ২৫৫৬নং

(৫৯) দেখুন ঃ আওয়ায়িলিশ শুহূর ১৫-১৬পৃঃ

উক্ত দলীল গ্রহণের উপর কয়েকটি আপত্তি আছে ঃ-

১। মুবারক হাদীসের এ অর্থ, যা প্রাথমিক শতাব্দীসমূহের কোন ইমাম, ফক্বীহ অথবা আলেম কর্তৃক প্রমাণিত নয়।[৬০] বরং তার বিপরীত অর্থে উম্মতের উলামা ও মিল্লাতের ফুক্বাহাগণের ঐকমত্য আছে, যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার হাওয়ালায় উল্লিখিত হয়েছে।

২। হাদীস ও ইলমে হাদীসের সাথে যুক্ত প্রত্যেক তালেবে ইল্‌ম এ কথা জানেন যে, কোন হাদীসের অর্থ নির্ধারণ করার পূর্বে সর্বাগ্রে উক্ত হাদীসের বিভিন্ন সূত্রের উপর দৃষ্টি ফিরানো হয়। কেননা, অনেক সময় হাদীস এক সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়, আবার অন্য এক সনদ সূত্রে অথবা অন্য কোন হাদীস-গ্রন্থে ঐ হাদীস সবিস্তার বর্ণিত হয়। একইভাবে একই অর্থের ভিন্ন সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীসমূহের প্রতিও নজর রাখতে হয়। তবেই পরিশেষে ঐ হাদীসের সঠিক সারার্থ নির্ধারিত হয়। এই নীতি মান্য ক'রেই মুহাদ্দিসীন ও হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ আলোচ্য হাদীসের অর্থ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং হাদীসের উলামাগণ সর্বাগ্রে উক্ত হাদীসের অন্যান্য সূত্রের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। অতঃপর একই অর্থের অন্য সাহাবা ﷺ-দের বর্ণনাসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক'রে এই পরিণামে পৌঁছেছেন যে, উক্ত হাদীসে 'অনুমান করা'র অর্থ হল, শা'বান মাসের গুনতি অনুমান করা, মাসের গুনতি ৩০ পূর্ণ করা।[৬১]

(৬০) কিছু অগ্রবর্তী উলামা, যাঁদের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁদের উক্তির প্রকৃতত্ব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(৬১) দেখুন ঃ তামহীদ ১৪/৩৫২, ফাতহুল বারী ৪/১৫৬, ত্বারহুত তাষরীব ৪/১০৫, উমদাতুল ক্বারী ১০/৩৭৩, মিরআত ৬/৪৩০, আরো দেখুন ঃ ফিক্বহুন নাওয়াযিল ২/৩০৮-৩১১,

প্রকাশ থাকে যে, সকল আভিধানিকগণ এ ব্যাপারে ইবনে সুরাইজের বিরোধিতা করেছেন এবং فاقدروا এর অর্থ অনুমান করা, পরিমাণ অনুযায়ী করা ইত্যাদি লিখেছেন। সুতরাং প্রসিদ্ধ আভিধানিক আবূ মানসূর আযহারী (জন্ম ৩৭০হিঃ) (فإن غم عليكم فاقدروا له) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, أي قدروا عدد الشهر وأكملوا ثلاثين يوماً. অর্থাৎ, মাসের সংখ্যা অনুমান ক'রে ৩০ দিন পূর্ণ ক'রে নাও। অতঃপর ইবনে সুরাইজের বিপরীত উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, 'প্রথম অর্থই আমার নিকট অধিক সঠিক ও স্পষ্ট।' (তাহযীবুল লুগাহ ৯/২২) 'লিসানুল আরাব'এর প্রণেতাও আযহারীর উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে নীরব থেকেছেন। (লিসানুল আরাব ৫/৭৮)

উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, প্রসিদ্ধ হাদীস-ব্যাখ্যাতা ইমাম খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ)র বুখারীর ব্যাখ্যায় আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন,

وذهب عامة العلماء إلى أن معنى التقدير فيه استيفاء عدد الثلاثين، وقد روي عن رسول الله ﷺ من طريق أبي هريرة وابن عمر، وهذا القول هو المرضي الذي عليه الجمهور من الناس والجماعة منهم.

অর্থাৎ, অধিকাংশ উলামা এই মত গ্রহণ করেছেন যে, উক্ত হাদীসে 'অনুমান' করার অর্থ ত্রিশ সংখ্যা পূরণ করা। আবূ হুরাইরা ও ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। এটাই সন্তোষজনক কথা, যার সমর্থক অধিকাংশ উলামা।[৬২]

হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

فَقَالُوا : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " فَاقْدُرُوا لَهُ " أَيْ أُنْظُرُوا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَاحْسِبُوا تَمَام الثَّلَاثِينَ ، وَيُرَجِّحُ هَذَا التَّأْوِيلَ الرِّوَايَاتُ الْأُخَر الْمُصَرِّحَة بِالْمُرَادِ وَهِيَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ " فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَنَحْوُهَا ، وَأَوْلَى مَا فُسِّرَ الْحَدِيثُ بِالْحَدِيثِ.

"অধিকাংশ উলামা বলেছেন, নবী ﷺ-এর উক্তি "তার জন্য অনুমান কর"---এর অর্থ, শুরু মাস থেকে লক্ষ্য রাখো এবং গণনায় ৩০ পূর্ণ কর। অন্যান্য বর্ণনা, যাতে সে কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেই সকল বর্ণনা উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করে। আর তা হল সেই সকল বর্ণনা যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে, "তোমরা গুনতি ৩০ পূরণ ক'রে নাও" ইত্যাদি। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল, হাদীসের ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারা।[৬৩]

অনুরূপভাবে 'গারীবুল হাদীষ' (হাদীসে উল্লিখিত বিরল শব্দাবলীর অভিধান) গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণও এই অর্থই নির্ধারণ করেছেন। (দেখুন ঃ গারীবুল হাদীষ, ইবনুল জাওযী ২/২২৩, আন্-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীষ ৪/২৩, তাফসীরু গারীবিল হাদীষ, ইবনে হাজার ১৯২পৃঃ)

* ইবনে সুরাইজই সেই প্রথম ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতি উক্ত (বিরোধী) অর্থের সম্পর্ক জুড়া সঠিক মানা যেতে পারে, যেমন এর সবিস্তার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

(৬২) আ'লামুল হাদীস ২/৯৪২

(৬৩) ফাতহুল বারী ৪/ ১২০

সেই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসীন, যাঁরা নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে আলোচ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের রচনা-ভঙ্গিও এ কথার প্রমাণ দেয় যে, যে বর্ণনায় "অনুমান কর" শব্দ আছে, তার ব্যাখ্যা করে সেই বর্ণনা, যাতে "গুনতি ৩০ পূর্ণ কর", "ত্রিশ গণনা কর" এবং "শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ কর" ইত্যাদি শব্দ আছে।[৬৪]

উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ-

(ক) ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ সহীহ গ্রন্থে কিতাবুস স্বাওম, বাব নং ১১তে যখন সর্বাগ্রে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর আলোচ্য হাদীস উল্লেখ করেছেন, তখন তার পরপরই তার ব্যাখ্যাতে হযরত ইবনে উমার ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র নিম্নলিখিত হাদীসও উল্লেখ করেছেন,

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)).

(১) "মাস ২৯ রাতের হয়। অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না। অতঃপর আকাশ মেঘলা থাকলে গুনতি ৩০ পূর্ণ ক'রে নাও।"[৬৫]

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)).

(২) "চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ কর। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূরণ ক'রে নাও।"[৬৬]

"অনুমান কর" শব্দের হাদীস উল্লেখ করার পর উক্ত হাদীসদ্বয়কে উল্লেখ ক'রে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই করেছেন যে, "অনুমান কর" শব্দে যে দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে, উক্ত হাদীসদ্বয়ে তার ব্যাখ্যা ও স্পষ্টতা রয়েছে। এই জন্য এটাই তার সঠিক ব্যাখ্যা ও বিবরণ।

(খ) ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)র ছাত্র ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ)ও অনুরূপ রচনা-ভঙ্গি এখতিয়ার করেছেন। সুতরাং তিনি সর্বাগ্রে হযরত ইবনে উমার ﷺ-এর আলোচ্য হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে "অনুমান কর"

(৬৪) এ ব্যাপারে বর্ণিত শব্দাবলী জানার জন্য দেখুন ঃ ফিক্বহুন নাওয়াযিল ২/২০৮-২০৯

(৬৫) বুখারী ১৯০৭, মুসলিম ১০৭০নং ইবনে উমার কর্তৃক।

(৬৬) বুখারী ১৯০৯নং আবূ হুরাইরা কর্তৃক।

শব্দ আছে। অতঃপর তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেওয়ার জন্য ঐ হাদীসের বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে কতিপয় শব্দ নিম্নরূপ ঃ-

((فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ)).

« فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ ».

অর্থ পূর্বের ন্যায়।[৬৭]

উক্ত দুই ইমাম ছাড়াও আরো দুইজন ইমাম এ ব্যাপারে অধিক স্পষ্টতার সাথে কাজ নিয়েছেন।

(গ) সুতরাং ইমাম ইবনে খুযাইমা (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ 'সহীহ' গ্রন্থে শিরোনাম বেঁধেছেন,

باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس

অর্থাৎ, পরিচ্ছেদ ঃ লোকেদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মাসের জন্য অনুমান করার আদেশ। অতঃপর এই পরিচ্ছেদের নিচে হযরত ইবনে উমারের ঐ হাদীসই উদ্ধৃত করেছেন, যাতে "অনুমান কর" শব্দ আছে। তারপর তা স্পষ্ট করার জন্য একটি নতুন পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন,

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوماً ثم صام

অর্থাৎ, পরিচ্ছেদ ঃ আকাশ মেঘলা থাকলে মাস অনুমান করার আদেশের অর্থ হল, শা'বান ৩০ দিন গণনা ক'রে রোযা রাখতে হবে---এ কথার দলীল।

এই পরিচ্ছেদের নিচে তিনি হযরত আবূ হুরাইরা ও হযরত ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র সেই দুটি হাদীসই উল্লেখ করেছেন, যে দুটি হাদীস ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

(ঘ) ইমাম ইবনে খুযাইমার ছাত্র ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ 'সহীহ' গ্রন্থে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,

ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان

লোকেদের আকাশ মেঘলা থাকার কারণে রমযানের চাঁদ না দেখা গেলে

(৬৭) মুসলিম ২৫৫১-২৫৫২নং

(৬৮) ইবনে খুযাইমা ৩/২০১-২০২

শা'বান অনুমান করার আদেশ।

অতঃপর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄-এর ঐ হাদীসই উল্লেখ করেছেন, যা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর ঐ হাদীসে "অনুমান কর"---এই কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত আরো পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরাইরা ﵁-এর সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা বুখারী শরীফের হাওয়ালায় গত হয়েছে ঃ-

ذكر البيان بأن قوله ﷺ: (فاقدروا له) أراد به أعداد الثلاثين

ذكر البيان بأن قوله ﷺ: (اقدروا له) أراد به أعداد الثلاثين

অর্থাৎ, এ কথার বিবরণ যে, নবী ﷺ-এর উক্তি "অনুমান কর" বলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিশ গুনতি পূরণ কর।[৬৯]

(ঙ) ইমাম বাগবী (রাহিমাহুল্লাহ)ও 'মাসাবীহুস সুন্নাহ'তে এই কথাকেই স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তিনি লিখেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ". وفي رواية قال : " الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ঈদ করো না। তোমাদের আকাশ মেঘলা থাকলে তার জন্য অনুমান ক'রে নাও।"

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, "মাস ২৯ রাতের হয়। অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না। অতঃপর আকাশ মেঘলা থাকলে গুনতি ৩০ পূর্ণ ক'রে নাও।"[৭০]

এই শ্রেণীর সকল হাওয়ালাকে যদি উদ্ধৃত করা হয়, তাহলে কাগজের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে যাবে। বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যে বর্ণনায় "অনুমান কর" শব্দ আছে, তা অস্পষ্ট। তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা অন্য বর্ণনায় আছে, যাতে

(৬৯) আল-ইহসান বিতারতীবি স্বাহীহি ইবনি হিব্বান ৫/ ১৮৬

(৭০) মিশকাত ১৯৬৯নং

বলা হয়েছে, "গুনতি ৩০ পূরণ ক'রে নাও" বা "ত্রিশ গণনা কর" ইত্যাদি। এটি এমন একটি মাসআলা, যাতে সকল মুহাদ্দিসীন ও হাদীস-ব্যাখ্যাতাগণ একমত।

বিষয়টিকে এত দীর্ঘ করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু যেহেতু আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) নিজের অবস্থানের জন্য এই হাদীসকে বুনিয়াদ বানিয়েছেন এবং তাঁরই অন্ধানুকরণ ক'রে আমাদের কিছু বুযুর্গজন ভারত উপ-মহাদেশে বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন, সেহেতু এই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। পরিশেষে বেশি কিছু না লিখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত ক'রে ক্ষান্ত হচ্ছি, যার মধ্যে একই বর্ণনায় একই বাগ্‌ধারায় "অনুমান কর"-এর ব্যাখ্যা বর্তমান আছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ أَتِمُّوه ثَلاثِينَ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহু তাবারাকা অতাআলা চাঁদকে পঞ্জিকা বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা দেখলে রোযা রাখো এবং তা দেখলে ঈদ কর। অতঃপর যদি তোমাদের আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে তার অনুমান কর, তা ৩০ পূরণ ক'রে নাও।[৭১]

এ হাদীস বড় স্পষ্ট শব্দে আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ ও আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুমাল্লাহ)র রায়কে খন্ডন করছে এবং বলছে যে, "অনুমান কর"-এর আসল অর্থ হল "ত্রিশ দিন পূরণ ক'রে নাও"। "অনুমান কর" মানে 'চান্দ্র-তিথি হিসাব কর' নয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

৩। হাদীসসমূহ পড়ার পর স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করার জন্য মহানবী ﷺ-এর মুবারক আদর্শ এই ছিল যে, তিনি এ ব্যাপারে কেবলমাত্র চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করতেন। অথচ মহান আল্লাহ তাঁকে অহী মারফৎ অবগত করাতে পারতেন। এখন স্পষ্ট যে, মহানবী ﷺ-এর আদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন পদ্ধতি হতে পারে না। হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু

(৭১) বাইহাক্বী ৮১৮৫, হাকেম ১৫৩৯, ইবনে খুযাইমা ১৯০৬নং

আনহা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বানের চাঁদ বা দিনকে স্মরণে রাখতে যতটা যত্ন নিতেন, ততটা অন্য কোন মাসের চাঁদ বা দিনকে স্মরণ রাখার জন্য যত্ন নিতেন না। অতঃপর রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। কিন্তু যদি (২৯ শা'বানের সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, তাহলে ৩০ দিন গণনা পুরো ক'রে নিতেন, তারপর রোযা রাখতেন।[৭২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম 'যাদুল মাআদ'-এ লিখেছেন,

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَةٍ مُحَقَّقَةٍ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ....

অর্থাৎ, নবী ﷺ-এর তরীকা এই ছিল যে, নিশ্চিতভাবে চাঁদ না দেখা অথবা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত রমযানের রোযায় প্রবেশ করতেন না।[৭৩]

তাঁর মুবারক আদর্শে এর বিপরীত আমল কোথাও প্রমাণিত নয় যে, তিনি চাঁন্দ্র-তিথি গণনা করেছেন অথবা তা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর না তাঁর পর তাঁর সাহাবা ও তাবেঈনগণ (রিযওয়ানল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) এ কাজ করেছেন।

৪। যে শরীয়ত আম-খাস, জাহেল ও আলেমের জন্য এসেছে, তাতে এমন কোন উদাহরণ মিলে না যে, একই আমল যা প্রত্যেক সামর্থ্যবান, জ্ঞানসম্পন্ন ও সাবালক মুসলিমের জন্য ফরয, অথচ তাতে আলেম ও জাহেল পৃথক। যেমন পবিত্র রমযানের রোযা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় আলেম ও জাহেলের মাঝে পার্থক্য হবে। এটি এমন একটি মত, যা কোন মুহাদ্দিস অবলম্বন করেননি। আর না তার সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে কোন দলীল আছে।

মোটকথা হল এই যে, বর্ণনা, যুক্তি, ভাষা বা অভিধান কোন দিক থেকেই

(৭২) আবূ দাউদ ২৩২৭, ইবনে খুযাইমা ১৯১০, ইবনে হিব্বান ৮৬৯নং
(৭৩) যাদুল মাআদ ২/৩৮

হাদীসের অর্থ তা হয় না, যা উক্ত বুযুর্গগণ করতে চাচ্ছেন।

দ্বিতীয় দলীল

উক্ত বুযুর্গগণ নিজেদের রায়ের সপক্ষে দ্বিতীয় দলীল যা পেশ করেছেন, তা হল মহানবী ﷺ-এর এই বাণী,

((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ)).

“আমরা নিরক্ষর জাতি। লিখতে জানি না, হিসাব করতেও জানি না। মাস এত হয়, এত হয়। অর্থাৎ, একবার ২৯ দিনে হয়, একবার ৩০ দিনে হয়।”[৭৪]

উক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চান্দ্র মাসগুলির শুরু ও শেষ জানার ব্যাপারে নিজেকে ও উম্মতকে নিরক্ষর তথা লেখাপড়া ও হিসাবে অজ্ঞ বলে আখ্যায়ন করেছেন। পরবর্তীতে যখন উম্মতের লোক সাক্ষর হল, বরং শিক্ষিত তথা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী লোক জন্ম নিল, তখন চাক্ষুষ চাঁদ দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকল না। ইত্যাদি।[৭৫]

কিন্তু এই দলীল গ্রহণে কতিপয় আপত্তি আছে ঃ-

(ক) উক্ত বুঝ নিয়ে দলীল গ্রহণ সলফের উলামা, বরং উম্মতের ‘ইজমা’র বিরোধী। প্রাথমিক শতাব্দী ও তার পরবর্তী কালে কোন গণ্যমান্য আলেম বা ইমাম হাদীসের সেই অর্থ গ্রহণ করেননি, যে অর্থ ওঁরা গ্রহণ করছেন। বড় আশ্চর্য ও অবাক ব্যাপার যে, আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ অগাফারা লাহ)র মতো আহলে হাদীস ও সালাফী আলেমের কলমের খোঁচায় এমন ব্যাখ্যা ও বিবরণ কীভাবে প্রকাশ পেল?! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা অন্ধানুকরণের পৃষ্ঠপোষক নই। কিন্তু তার সাথে সাথে এ কাজকেও আহলে হাদীসের মতাদর্শের বিলকুল বিপরীত মনে করি যে, কোন আয়াত বা হাদীসের এমন অর্থ গ্রহণ করা হবে, যে অর্থ সলফদের বুঝের প্রতিকূল। বরং খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে রাখি যে, আমার মতে খাওয়ারেজ ও অন্যান্য বাতিল

([৭৪]) বুখারী ১৯১৩, মুসলিম ২৫৬৩নং

([৭৫]) আওয়ায়িলুশ শুহূর, আহমাদ শাকের ১৩-১৪, মাজমাউল ফিক্বহ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা, ২য় খন্ড, ৮৪২পৃঃ, শায়খ মুস্তাফা কামালের প্রবন্ধ।

ফির্কাগুলির সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, তারা কিছু আয়াত ও হাদীসের সেই অর্থ নির্ধারণ করেছিল, যা সাহাবা ও তাবেঈনদের বুঝের সাথে অমিল ছিল। এই জন্য আশঙ্কা হয় যে, কুরআন-হাদীসের এমন বিস্ময়কর বিরল অর্থ গ্রহণকারীরা মহান আল্লাহর সেই ধমকে শামিল হবে, যাতে বলা হয়েছে,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

“যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!” (নিসা ঃ ১১৫)

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে সেই প্রবণতা আমাদের যুব-সমাজ ও নতুন শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে (শুকনো কাশফুলে আগুন লাগার মতো) দ্রুততার সাথে বেড়ে চলেছে। অতঃপর যখন তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে, তখন বড় দুঃসাহসিকতা ও অহংকারের সাথে বলে বসছে, ‘আমরা কারো মুক্বাল্লিদ নই!’ নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

(খ) উলামাগণের উক্তি থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য হাদীস উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য প্রশংসা স্বরূপ কথিত হয়েছে। আর ওঁদের দলীল গ্রহণে তার যে অর্থ বিবৃত হয়েছে, তাতে দোষ বা ত্রুটি প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ যে আয়াত ও হাদীস উম্মতের জন্য প্রশংসা ও সুগুণ স্বরূপ এসেছে, তার আনুগত্য করাতেই উম্মতের মঙ্গল রয়েছে। এটি এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয়, যা শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পুস্তিকা ‘আল-হিলাল’-এ অতি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন এবং একাধিক যুক্তি পেশ ক’রে উক্ত অর্থকে স্পষ্ট করেছেন। প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উচিত, তার প্রতি রুজু করা।

শায়খুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

وَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأُمِّيَّةَ الْمَذْكُورَةَ هُنَا صِفَةُ مَدْحٍ وَكَمَالٍ مِنْ وُجُوهٍ : مِنْ جِهَةِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ بِمَا هُوَ أَبْيَنُ مِنْهُ وَأَظْهَرُ وَهُوَ الْهِلَالُ . وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ

الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ هُنَا يَدْخُلُهُمَا غَلَطٌ . وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِمَا تعَبًا كَثِيرًا بِلَا فَائِدَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ شُغْلٌ عَنْ الْمَصَالِحِ إِذْ هَذَا مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ نَفْيُ الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ عَنْهُمْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِخَيْرٍ مِنْهُ وَلِلْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِيهِ كَانَ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ فِي ذَلِكَ نَقْصًا وَعَيْبًا بَلْ سَيِّئَةً وَذَنْبًا فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْأُمَّةِ الْأُمِّيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنْ الْكَمَالِ وَالْفَضْلِ السَّالِمِ عَنْ الْمَفْسَدَةِ وَدَخَلَ فِي أَمْرٍ نَاقِصٍ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْفَسَادِ وَالِاضْطِرَابِ .

“এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হল যে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত ‘নিরক্ষরতা’ প্রশংসামূলক ও পরিপূরক গুণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ-

১। চাঁদ দেখা, যা নিতান্তই স্পষ্ট জিনিস, যার দ্বারা লেখাজোখা ও হিসাবের প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যায়।

২। এ ক্ষেত্রে লেখাজোখা ও হিসাবে ভুল ঢোকার সম্ভাবনা আছে।

৩। লেখাজোখা ও হিসাবে অহেতুক বহু কষ্ট আছে, কেননা তাতে ব্যস্ত হওয়ার ফলে অন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মে মনোযোগ দূর হয়ে যায়। পরন্তু লেখাজোখা ও হিসাব হুবহু উদ্দিষ্ট নয়, বরং তা উদ্দিষ্ট জিনিস লাভের একটা অসীলা।

সুতরাং যখন লেখাজোখা ও হিসাব রদ্দ করা হল, যেহেতু তার থেকে উত্তম জিনিস তার অভাব পূরণ করে এবং যেহেতু তাতে ব্যস্ততার ফলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তখন এ ক্ষেত্রে লেখাজোখা ও হিসাব ত্রুটিরূপে পরিগণিত হয়। বরং তা পাপ ও অপরাধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অতএব যে ব্যক্তি (এ ব্যাপারে) লেখাজোখা ও হিসাবের গোলকধাঁধায় ফেঁসে যাবে, সে ব্যক্তি নিরক্ষর উম্মতের যে বিঘ্নহীন পরিপূর্ণতা ও মর্যাদা ছিল, তা হতে বের হয়ে যাবে এবং এমন অপূর্ণ বিষয়ে প্রবেশ করবে, যা তাকে বিঘ্ন ও সংকটের দিকে পৌঁছে দেবে।” [৭৬]

আল্লামা তাক্বিয়্যুদ্দীন সুবকী উক্ত হাদীসে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, “আরব বা এ উম্মতের এ বিষয়ে লেখাজোখা ও হিসাব না জানা একটি মর্যাদার বিষয়। কেননা, আল্লাহর ইল্‌মে এ কথা নির্ধারিত ছিল যে, এরা

[৭৬] মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/ ১৭৪

নিরক্ষর নবীর উম্মতে শামিল হবে।” [৭৭]

উল্লিখিত দুই ইমাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইমাম সুবকীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত নিরক্ষরতা এবং লেখাজোখা ও হিসাব সম্বন্ধে অজ্ঞতা এ উম্মতের জন্য প্রশংসা ও পরিপূর্ণতামূলক অন্যতম গুণ। তা কোন দোষ বা নিন্দনীয় গুণ নয় যে, তা হতে মুক্তিলাভ করতে হবে। বরং তার উদাহরণ এই যে, কোন শহরে নোংরামি ও অসৎকর্মের আড্ডা আছে। তার সমালোচনা কোন মজলিসে হলে কেউ বলল, ‘আমি তো সে শহর জানিই না, আর না আমি তার পথ চিনি।’ এখন বক্তার ঐ না জানা ও না চেনা এ ব্যাপারে তার জন্য কোন ত্রুটিমূলক গুণ নয়; বরং তা তার জন্য প্রশংসা ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতামূলক সদ্‌গুণ। সুতরাং সতর্ক হওয়া উচিত।

(গ) আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত শব্দ ‘আমরা নিরক্ষর উম্মত’-এর সাথে ‘লেখাজোখা ও হিসাব জানি না’ এবং ‘মাস এত হয়, এত হয়’ শব্দগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে এই খবর দেওয়া হয়েছে যে, উম্মত চাঁদ ও চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ নির্ণয় করা ব্যাপারে জ্যোতিষ বা চান্দ্র-তিথির হিসাব জানার মুখাপেক্ষী নয়। বরং মাস ২৯ দিনের হবে, নচেৎ ৩০ দিনের। যা জানার উপায় হল চাঁদ দেখা অথবা চলতি মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হওয়া; যেমন এ কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আদৌ এই নয় যে, যখন এই উম্মত হতে নিরক্ষরতার গুণ দূর হয়ে যাবে, তখন তার নির্ভরতা জ্যোতির্বিদ্যা বা চান্দ্র তিথির হিসাবের উপর হবে এবং উম্মত চাঁদ দেখার মুখাপেক্ষী থাকবে না।

সুতরাং হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, “এই হাদীসে হিসাব বলতে উদ্দেশ্য হল, গ্রহ-নক্ষত্রের গমনাগমন ও তার কক্ষসমূহের হিসাব (জ্যোতির্বিদ্যা)। কেননা, সেই সময় সেখানে উক্ত বিদ্যার বিদ্বান খুব কম লোকই ছিল। এই জন্য রোযা রাখা ইত্যাদি ব্যাপারকে চাঁদ দেখার সাথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যার কারণ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করাতে যে সমস্যাবলী ছিল, তা হতে রেহাই দেওয়া। তার পরেও রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে একই নির্দেশ অব্যাহত থাকল; যদিও উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী লোক জন্মলাভ করল। বরং হাদীসের পূর্বাপর বাচনভঙ্গি এ

[৭৭] আল-আলামুল মানশূর ১৮- ১৯পৃঃ

কথা স্পষ্ট করে যে, চান্দ্র তিথি বা তারকা গমনাগমনের বিদ্যার উপর মোটেই নির্ভর করা উচিত নয়। এ কথার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে মহানবী ﷺ-এর এই হাদীসে, তিনি বলেছেন,

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)).

"আকাশ মেঘলা থাকলে গুনতি ৩০ পূর্ণ ক'রে নাও।"

সুতরাং নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে, যদি তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা কর। (বরং বলেছেন, "গুনতিতে ৩০ দিন পূরণ কর।"[৭৮]

জ্যোতিঃশাস্ত্র বা পঞ্জিকা দ্বারা চান্দ্র মাস প্রমাণকারীদের বর্ণিত দলীলসমূহের একটা সমীক্ষা পেশ করা হল, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হল যে, প্রথমতঃ তাঁদের দলীল স্বস্থানে স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা এমন একটি অভিমত, যা সলফদের ইজমা' (ঐকমত্যে)র বিপরীত। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) যুক্তিগতভাবে উক্ত অভিমতকে বাতিল প্রমাণ করেছেন। অনুরূপ বর্তমান যুগে শায়খ বাক্র বিন আবূ যায়দ (রাহিমাহুল্লাহ)ও তাঁর কিছু প্রবন্ধে উক্ত বিষয়টির উপর সবিস্তার আলোকপাত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, জ্যোতিঃশাস্ত্র দ্বারা চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ গ্রহণ করাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রকট হয় ঃ-

এক ঃ জ্যোতিষ ও নক্ষত্র-বিদ্যা এখনো পর্যন্ত ধারণা ও অনুমানের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি।

দুই ঃ জ্যোতিষ ও নক্ষত্র-বিদ্যার মাধ্যমে চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ মেনে নেওয়াতে একাধিকভাবে শরীয়তের বিরোধিতা করা হয়।[৭৯]

জ্যোতিষ তথা নক্ষত্র-বিদ্যা ধারণাপ্রসূত বিদ্যা

জ্যোতির্বিদগণ স্বীকার করেন না যে, তাঁদের বিদ্যা ধারণাপ্রসূত এবং

(৭৮) ফাতহুল বারী ৪/১৩২, আরো দেখুন ঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৪/১৯১-১৯২, আ-রিয্বাতুল আহওয়াযী ৩/৩০৭, আল-আলামুল মানশূর ১৮, ৩৪, মিরআত ৪/৪৩৪, ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/২১১-২১৪ প্রভৃতি

(৭৯) ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/২১৭, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ৩/৮৫

অনিশ্চিত। বরং উক্ত বিদ্যার সপক্ষে প্রতিবাদ ক'রে বলেন, 'মিনিট ও সেকেন্ড নির্ণয় ক'রে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমানে চাঁদ দেখার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত।' পক্ষান্তরে সত্য কথা এই যে, এটা কেবল দাবীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য তাঁদের এই দাবীকে চ্যালেঞ্জ করা এই জন্য মুশকিল যে, সাধারণতঃ শরয়ী ইল্‌মের পন্ডিতগণ এবং দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তিবর্গ উক্ত আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী নন। এই জন্য উক্ত বিদ্যার দাবীদারদেরকে জবাব দেওয়া মুশকিল। অথচ প্রকৃতত্ব এই যে, উক্ত বিদ্যা আজ পর্যন্ত ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যার কিছু কারণ নিম্নে বিবৃত হল ঃ-

বহু ঘটনা এমন ঘটে থাকে, যা জ্যোতিষীদের দাবীকে ভুল প্রমাণিত করে। সুতরাং ১৪০৬ হিজরীতে জ্যোতির্বিদগণ নিশ্চয়তার সাথে বললেন যে, এ বছরে শওয়ালের চাঁদ ২৯শে রমযানের সন্ধ্যায় দেখা যাবে না। আর এ খবর স্থানীয় সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত হল। কিন্তু আল্লাহর কুদরত যে, সঊদী আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জন লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। অনুরূপভাবে অন্য দেশেও চাঁদ দেখা গেল।[৮০]

* সন ১৪২৪ হিজরীতে সঊদী আরবে জ্যোতির্বিদদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রচার হল যে, এবারে রমযানের চাঁদ ২৯শে শা'বানের সন্ধ্যায় অবশ্যই দেখা যাবে। এ খবর লোকেদের মাঝে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়লে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আজ তারাবীহর নামায পড়া হবে এবং কাল রোযা হবে। বহু মসজিদে (২৯শে রমযানের দিবাগত রাত্রে) এই সামান্য গুজবেই কান দিয়ে তারাবীহর নামাযও পড়া হয়ে গেল। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে হাজার-হাজার লোকের দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে নতুন মেহমানের দর্শন লাভের অপেক্ষায় স্থির ছিল। সঊদী আরব হাজার-হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত। তবুও কোন এলাকাতে কোন একটি লোকও ঐ নতুন মেহমানের দর্শনলাভে ধন্য হল না। এমনকি সুদাইর এলাকার সেই লোকও নয়, যার দৃষ্টিশক্তি প্রখর বলে---আল-হামদু লিল্লাহ---মানুষ তার উপর যথেষ্ট নির্ভর ক'রে থাকে। সেই ব্যক্তিও ওযর পেশ করল যে, সেও আজ দর্শনলাভে ধন্য হতে পারেনি। পরিশেষে সকলকে মেনে নিতেই হল যে, আগামী কাল রোযা নয়।

(৮০) ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/২১৭, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ৩/৮৫

* (মক্কার) রাবেতা-এ-আলামুল ইসলামীর মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামীতে এ বিষয় নিয়ে কয়েকবার গবেষণা করা হয়েছে এবং তাতে এ বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারটা নিশ্চিত, না অনিশ্চিত? আলোচনা চলাকালে বিভিন্ন মতামত সামনে এল। তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু সুদক্ষ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ১৪ রবীউল আখের ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের সভায় সভাপতি বললেন, 'কিছু লোকের মুখে উল্লিখিত কথা আপনারা শুনেছেন, কেউ বলছেন, তা ধারণাপ্রসূত অনিশ্চিত। কেউ তা নিশ্চিত হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন। কেউ তা প্রায় নিশ্চিত বলে দাবী করছেন।' *(মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড, ১০৩০পৃঃ)*

উক্ত ঘটনাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক পন্ডিতদের স্বীকারোক্তি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জ্যোতির্বিদ্যা এখনো পর্যন্ত অনুমানের সীমানায় অবস্থান করছে। বরং উক্ত ঘটনাবলী যেমন একদিকে জ্যোতির্বিদগণকে এই সবক দিচ্ছে যে, নিজেদের সীমা অতিক্রম করবেন না। তেমনি অন্য দিকে শরীয়তের পন্ডিতগণকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পন্ডিতগণের প্রত্যেক দাবীকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সাবধান হন।

* জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমস্ত ব্যাপার বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রের সাথে সীমাবদ্ধ। যা যে কোনও সময়ে বিকল হয়ে যেতে পারে। আর অনেক সময় এমনও হয় যে, ঐ বিকলতার খবর উক্ত ময়দানের কর্মচারীদেরও থাকে না। প্রত্যহ ঘটে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয় বিশ্বের মানুষ। আধুনিক টেকনোলোজির বিকলতার পরিণতি সবাই জানে। কেবল উড়ো-জাহাজ সম্পর্কিত দুর্ঘটনাবলী শিক্ষা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

* এ কথা সাধারণতঃ বিদিত যে, অধুনা যুগে কোন কোন ইসলামী শহরের লোকেরা রোযা ও ঈদ করার ব্যাপারে জ্যোতিষের পঞ্জিকার উপর নির্ভরশীল। তাদের নিকট চাঁদ দেখার কোনই গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক সময় তাদের দেশ এবং চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল দেশের মধ্যে দুই বা তিন দিনের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ এটা জ্ঞান ও বিবেকের দিক থেকে অযৌক্তিক।

* এ কথাও প্রত্যেকের বিদিত যে, একই দেশের একাধিক পঞ্জিকার পরস্পরের মাঝে মিল নেই। কোনটাতে রমযান মাস ৩০ দিনের লেখা থাকে এবং কোনটাতে ২৯ দিনের। এই পরস্পর-বিরোধিতা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, জ্যোতির্বিদদের বিদ্যা এখনো পর্যন্ত ধারণা ও অনুমানের সীমা অতিক্রম করেনি।[৮১]

কিছুদিন পূর্বে আমি এক সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আল-গাত্ব শহরের 'আল-হানা' ডিয়ারি ফার্মের কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ার আমেরও উপস্থিত ছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিই মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন যে, ১৯৮৭ সনের জানুয়ারী মাসে মিসরী সংবাদমাধ্যমসমূহ প্রচার করল যে, অমুক তারীখে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে। যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, সেহেতু এই খবরের ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, পূর্ণগ্রাস তো দূরের কথা, আংশিক গ্রহণও লাগেনি।

এইভাবে ৪ঠা মে মোতাবেক ১৫ রবীউল আওয়াল (১৪২৪ হিঃ) মঙ্গলবার সউদী আরবের সকল খবরের কাগজে খবর ছাপা হল যে, আজ রাত্রি ৯টা বেজে ৪৭ মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে এবং ১১টার সময় চাঁদ পূর্ণ গ্রাসের কবলিত হবে। কিন্তু দর্শকরা দেখল যে, জ্যোতির্বিদদের নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২০ মিনিট পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। বরং পরের দিন খবরের কাগজে প্রকাশ হল যে, চন্দ্রগ্রহণ রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটেই শুরু হয়েছিল।

জ্যোতির্বিদ্যার সাথে শরীয়তের সংঘর্ষ

চাঁদ দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা শরীয়তের সাথে আদৌ মিল খায় না। যার অনেক কারণ আছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হল ঃ-

১। শরয়ী মাসসমূহ শুরু ও শেষ, দিনের সংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্যোতিষীদের নির্ধারিত মাস অপেক্ষা পৃথক। যেমন এ বিষয়ে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২। শরীয়ত চান্দ্র মাসের শুরুকে চাঁদ দেখার সাথে দায়বদ্ধ করেছে এবং স্পষ্টভাবে এ কথা বলে দিয়েছে যে, শরয়ী মাস ২৯ দিনের হবে অথবা ৩০ দিনের। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিদদের নিকট চাঁদ দেখার কোন গণ্যতাই নেই। বরং তাঁদের নিকট প্রত্যেক চান্দ্র মাস ২৯ দিন, ১২ ঘন্টা, ৪৪ মিনিট ও কিছু সেকেন্ডের হয়। চাহে চাঁদ দেখা যাক অথবা না যাক।

---
[৮১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/৩১৬-৩১৮

৩। শরীয়ত চান্দ্র মাসের শুরুকে একটি প্রকৃতিগত ও প্রকাশ্য জিনিসের সাথে সন্নিবেশিত করেছে। না তাতে কোন কষ্ট আছে, আর না-ই এমন কোন ব্যস্ততা আছে, যা বান্দাকে তার জরুরী কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে। বরং যে ব্যস্ততা আছে, তা শরীয়তের নির্দেশই। এই জন্যই শরয়ীত এর জন্য একটি যিক্র (দুআ) শিক্ষা দিয়েছে। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিদরা এ ব্যাপারে ভিন্নমুখী।

৪। জ্যোতির্বিদদের কথায় আমল করলে কিছু সহীহ হাদীসের উপর আমল প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, যে হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, "আকাশ (মেঘ বা অন্য কারণে) অপরিষ্কার থাকার ফলে চাঁদ দেখা না গেলে গণনায় ৩০ পূর্ণ ক'রে নাও।" এখন যদি আমরা জোতির্বিদদের কথা মেনে নিই, তাহলে ঐ হাদীসগুলির লাভ কী? বরং এইভাবে এই শ্রেণীর সকল হাদীস বেকার হয়ে ডাস্‌বিনে যাবে! [৮২]

সারসংক্ষেপ কথা এই যে, চান্দ্র মাসের ব্যাপারে জোতির্বিদ্যার উপর নির্ভরশীলতা মুহাম্মাদী শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই জন্য এ মাসআলাকে নিজের অবস্থায় থাকতে দেওয়া হোক এবং তাতে উম্মতকে জড়িয়ে তার মাঝে সর্বসম্মত বিষয়ের ঐকমত্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হতে বিরত রাখা হোক। এটাই হল নিরাপত্তার পথ। কেননা, চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ হওয়ার মাসআলা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐকমত্যের সাথে চলে আসছে এবং সেই সকল উলামা, যাঁদের ঐকমত্য গণ্য করা হয়, তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ ও নক্ষত্রবিদদের কোন গণ্যতা নেই। বর্তমান যুগেও উলামাগণ গবেষণা ও আলোচনা ক'রে দেখার পর উক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, সঊদী আরবের স্থায়ী উলামা-কমিটি একমত হয়ে এক সিদ্ধান্তনামায় লিখেছেন,

أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك، وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». الحديث ولقوله ﷺ: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» الحديث.

[৮২] ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/৩১৮, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ৩/৮৭-৯০, এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট দ্রঃ

"বাকী থাকল জ্যোতিষ-হিসাবের মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণ করার কথা, সুতরাং সে ব্যাপারে স্থায়ী কমিটির প্রস্তুতকৃত (প্রবন্ধাদি) অধ্যয়নের পর এবং উলামাগণের উক্তির প্রতি রুজু করার পর কমিটির সদস্যগণ তা গণ্য না করার উপর একমত হন। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা কর এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।---" (আল-হাদীস) এবং "চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ঈদ করো না।" (আল-হাদীস) [৮৩]

অনুরূপভাবে (মক্কার) ইসলামী ওয়ার্ল্ড লিগের ফিক্বহী কমিটির সদস্যদের নিকট সিঙ্গাপুর থেকে একবার একটি চিঠি এল, তার সারসংক্ষেপ এই ছিল যে, সিঙ্গাপুরের জমঈয়াতুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ও আল-মাজলিসুল ইসলামীর মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হল। জমঈতের রায় হল, এ বছর অর্থাৎ, ১৩৯৯ হিজরীর রমযানের শুরু চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই হবে। পক্ষান্তরে মাজলিসের অভিমত ছিল, যেহেতু এশিয়ার এই এলাকা বিশেষ ক'রে সিঙ্গাপুরে অধিকাংশ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, এই পবিত্র মাসের প্রারম্ভ জ্যোতিষী হিসাব অনুযায়ী মেনে নেওয়া হোক। এ বিষয়ে ফিক্বহী কমিটির সদস্যদের অভিমত কী?

মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামীর কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত হয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ-

"মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামীর কমিটির সদস্যবৃন্দ বিষয়টির সম্পৃক্ত শরয়ী দলীলাদি নিয়ে পূর্ণ আলোচনা-গবেষণা করার পর এবং উক্ত বিষয়ে স্পষ্ট দলীলসমূহের ভিত্তিতে জমঈয়াতুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অনুরূপভাবে সিঙ্গাপুরের সেই সকল এলাকা, যেখানে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, একই ভাবে এশিয়ার আরো অন্যান্য এলাকার অবস্থা, যেখানে চাঁদ দেখা সম্ভব নয়, সেখানকার মুসলিমদের উচিত, তাঁরা ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন এমন এক ইসলামী দেশের উপর নির্ভর করবেন, যে দেশের মুসলিমরা চাক্ষুষ চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি (ক'রে রোযা-ঈদ) করেন এবং কোনভাবেই হিসাব বা পঞ্জিকার উপর ভিত্তি (ক'রে রোযা-ঈদ) করেন না। এতে মহানবী ﷺ-এর

[৮৩] আবহাসু হাইআতি কিবারিল উলামা' ৩/৩৪

নির্দেশের উপর আমল হয়, যেহেতু তিনি বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। অতঃপর তোমাদের আকাশ মেঘলা থাকলে গণনায় ৩০ পূরণ ক'রে নাও।" তিনি আরো বলেছেন, "চাঁদ না দেখে অথবা গুনতি ৩০ পুরা না ক'রে তোমরা রোযা রেখো না, চাঁদ না দেখে অথবা গুনতি ৩০ পুরা না ক'রে তোমরা ঈদ করো না।" অনুরূপ এ মর্মে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [৮৪]

[৮৪] মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড, ৯৬৯-৯৭০পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা

উদয় হওয়া মানে প্রকাশ হওয়া, ওঠা। উদয়স্থল মানে যে স্থল, স্থান বা জায়গায় উদয় বা প্রকাশ হয় বা ওঠে। চাঁদ-সূর্য যে স্থল, স্থান বা জায়গায় উদয় বা প্রকাশ হয় বা ওঠে, তাকেই (চাঁদ বা সূর্যের) 'উদয়স্থল' বলে।

উদয়স্থল বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হল, চাঁদ অদৃশ্য হওয়ার ১ বা ২ দিন পর পশ্চিমাকাশে পুনরায় প্রকাশ হওয়ার জায়গা। এটা এইভাবে বোঝা যায় যে, একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত সকল স্থানে চাঁদ ও সূর্য একই সময়ে উদয় হবে এবং একই সময়ে অস্ত যাবে। যেমন হায়দ্রাবাদ, সিন্ধ, কাবুল ও তাশকন্দের দ্রাঘিমারেখা প্রায় ৬৮ ডিগ্রি পূর্ব। যদি হায়দ্রাবাদ ও সিন্ধে সকাল ৬টা বেজে ২২ মিনিটে সূর্যোদয় হয়, তাহলে কাবুল ও তাশকন্দেও একই সময়ে সূর্যোদয় হবে। একই ভাবে যদি তাশকন্দে চাঁদ সূর্যাস্তের পর দেখা যায়, তাহলে উক্ত রেখায় অবস্থিত সকল স্থানে চাঁদ দেখা যাবে। তবে শর্ত হল, যেন আকাশ পরিস্কার থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধ, কাবুল ও তাশকন্দের উদয়স্থল এক বা অভিন্ন।

অতিরিক্ত স্পষ্ট করার জন্য বলা যায় যে, (ক) জায়গা (খ) জায়গা থেকে পুরো ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থিত। অর্থাৎ যদি (খ) জায়গার দ্রাঘিমারেখা ৭৫ ডিগ্রি পূর্ব এবং (ক) জায়গায় ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম হয়, তাহলে ২৩ মার্চ বা ২৩ ডিসেম্বর যে সময়ে (খ) জায়গায় সূর্যোদয় হবে, সেই সময়ে (ক) জায়গায় সূর্যাস্ত হবে এবং সেখানে রাত শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং (ক) জায়গার উদয়স্থল (খ) জায়গার উদয়স্থল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। [৮৫]

উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তবতা

চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা এমন একটি বাস্তবতা, যার ব্যাপারে দ্বীনের উলামাগণ এবং জ্যোতির্বিদগণ একমত। এ কথার উপরে সকল উলামাগণ একমত যে, যেভাবে এক শহর থেকে অন্য শহরে সূর্যের উদয়-অস্তের সময়ের পার্থক্য আছে, ঠিক একই ভাবে নতুন মাসের

[৮৫] আশ-শামসু অল-ক্বামারু বিহুসবান, মাজাল্লাতুদ দা'ওয়াহ খন্ড ১৪, সংখ্যা ১২, ৪১পৃঃ

চাঁদের উদয় ও অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য থাকে।[৮৬]

উদয়স্থলের ভিন্নতা কেন?

ভূগোলশাস্ত্রবিদগণ দূর ও নিকটকে স্পষ্ট করার জন্য, দুই দেশের ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য, ভূপৃষ্ঠের স্থানসমূহ ও বিভিন্ন দেশের সময় নির্ধারণের জন্য ভূগোলককে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে (কাল্পনিক) কিছু রেখা টেনে ভাগ করেছেন। যে রেখা উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়, তাকে 'দ্রাঘিমারেখা' এবং যে রেখা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়, তাকে 'অক্ষরেখা' বলা হয়। এই (দ্রাঘিমা) রেখাগুলির (জিরো) কেন্দ্র লন্ডন শহরের (পূর্ব দিকে .০৫ ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থিত) প্রসিদ্ধ মহল্লা গ্রিনিচকে নির্ধারিত করা হয়েছে। এবারে যে স্থান লন্ডন শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত, তার জন্য বলা হয়, তা এত ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত। আর যে স্থান তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তার জন্য বলা হয়, তা এত ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত। উদয়স্থলের বাস্তবতাকে বুঝার জন্য এই দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখাকে বুঝা জরুরী। যার বিশদ বিবরণের জায়গা এ পুস্তিকা নয়।[৮৭] অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে এ কথা স্মৃতিতে থাকা উচিত যে, যদি দুটি শহর একই দ্রাঘিমারেখা বা তার নিকটস্থ দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত হয়, তাহলে উভয় শহরের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন প্রভাব থাকে না।

উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রাস (তামিলনাড়ু) ও কাশ্মীর অথবা রিয়াদ ও মস্কো প্রায় একই দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত। এই জন্য উক্ত উভয় স্থানের মাঝে সূর্য বা চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি দুটি স্থান একই অক্ষরেখাতে অবস্থিত হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে উদয়স্থলের পার্থক্য পড়তে পারে। এই জন্য চাঁদ দেখার বিষয়ে গবেষণা করার পূর্বে উক্ত পয়েন্টকে সামনে রাখা জরুরী।

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা নিম্নে মওলানা মুহাম্মাদ

(৮৬) দেখুন ঃ আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ ১০৬পৃঃ, রাহমাতুল উম্মাহ ১৯৪পৃঃ, তানবীহুল গা-ফিলি অল-অসনান ১০৪পৃঃ, ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ২৭৩পৃঃ, আবহাষু কিবারিল উলামা ৩/৩৩

(৮৭) এ ব্যাপারে আগ্রহীদের জন্য মওলানা আব্দুর রহমান কীলানীর পুস্তক 'আশ্-শামসু অল-ক্বামারু বিহুসবান' বড় উপকারী।

য়্যাহয়া আ'যমীর দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করছি। এ প্রবন্ধটি ফাতাওয়া সানাইয়্যাহর প্রথম খন্ড সিয়াম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। আমরা তা হতে কেবল চাঁদ দেখা ও উদয়স্থলের ভিন্নতার অংশটি উদ্ধৃত করছি। মওলানা লিখছেন,

"আচ্ছা, এখন আপনি চাঁদ দেখার সময়ে চাঁদের কেমনত্ব লক্ষ্য করুন। কত সূক্ষ্ম ও সূর্যের নিকটবর্তী হয়। অতঃপর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় দেখুন, অপেক্ষাকৃত বড় এবং পূর্ব দিকে (সূর্য থেকে) আরো দূরে নজর আসবে। পুনরায় তৃতীয় দিন আরো বড় এবং পূর্ব দিকে (সূর্য থেকে) আরো দূরে সরে যাবে। কথা এই যে, চাঁদ সূর্য থেকে যত দূর হতে থাকে, ততই তার আলো আমাদের মাঝে ছড়াতে থাকে। এইভাবে দেখতে থাকুন। পরিশেষে চাঁদ ১৪ তারীখের রাত এবং কখনো ১৩ তারীখের রাত এবং ১৫ তারীখের রাতে চাঁদ সূর্যের বিপরীত পূর্ব দিকে ১৮০ ডিগ্রি অর্থাৎ, আকাশ বৃত্তের অর্ধেক দূরত্বে সরে যায়। যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে নিজের মাথা লুকাতে শুরু করে, তাহলে চাঁদ পূর্বাকাশে নিজের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আমাদের মাঝে বিতরণ করতে লাগে। যেন সামনাসামনি সমকক্ষের একটি যুগল। এই সামনাসামনি অবস্থাতে আমরা চাঁদকে পূর্ণিমা রূপে দেখতে পাই। সেই সময় চাঁদের অর্ধেক উজ্জ্বল ভাগের পুরোটাই আমাদের সম্মুখে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই সামনাসামনির সময়ে যদি চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় চলে আসে, তাহলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। অতঃপর চাঁদ দিনের দিন সূর্যের কাছাকাছি আসতে থাকে এবং আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেখা যায়। এতেও ঐ একই কথা, তবে বিপরীতমুখী। কেননা, চাঁদের সূর্যের কাছাকাছি হওয়ার ফলে তার আলোময় অংশ আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হতে থাকে। পরিশেষে ২৮ বা ২৯ এর রাত্রে চাঁদ সূর্যের ১২ ডিগ্রি নিকটবর্তী হয়ে ২ রাত্রি কখনো ১ বা ৩ রাত্রি আমাদের নজর থেকে বিলকুল অদৃশ্য হয়ে যায়। এই একত্র হওয়ার অবস্থাকে আমরা অমাবস্যা বলি। এই সময়ে চাঁদের অর্ধেক উজ্জ্বল দিক সূর্যের দিকে থাকে এবং পিছনের অর্ধেক অন্ধকার দিক আমাদের দিকে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই একত্র হওনে যদি সূর্যের দিকে তাকাতে আমাদের দৃষ্টির মাঝে চাঁদ পড়ে, তাহলে তখন সূর্যগ্রহণ হয়। মনে রাখার কথা যে, অমাবস্যার সময়, যার মধ্যম পরিমাণ ৪৭ ঘন্টা ১৬ মিনিট, এই সময়ে এমন এক বিশেষ মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, যখন চাঁদ ও সূর্য একই সরল রেখায়, অন্য কথায় দ্বিপ্রহরে এক সূত্রে এসে যাওয়া জরুরী। আর সেটা হল সেই সময়, যখন অমাবস্যা শুরু হওয়ার পর ৩৩ ঘন্টা ৩৮ মিনিট

পার হয়ে যায়। বাস্, এখান থেকেই চাঁদ দেখার হিসাব শুরু করুন।

ধরে নিন, আযমগড় শহর, যা ৮৩ ডিগ্রি ১৩ মিনিট দ্রাঘিমারেখাতে অবস্থিত, তার পশ্চিমাকাশে ৬টার সময় সূর্য অস্ত গেল এবং ৬টা বেজে ২২ মিনিটের কিছু সেকেন্ড পূর্বে চাঁদ ও সূর্যের এক সূত্রে সমাবেশ ঘটল এবং একই দ্রাঘিমারেখাতে উভয়ের উপস্থিতি ঘটল। এরপর রাত ও দিনভর অপেক্ষা করতে থাকুন। পরিশেষে ২৩ ঘন্টা ৩৮ মিনিট পরে, অর্থাৎ ৬টা বাজার কিছু সেকেন্ড আগে চাঁদ সূর্য থেকে ১২ ডিগ্রি দূরত্বে পূর্ব দিকে চলে গিয়ে ধনুকের আকার ধারণ করে। বাস্, ঠিক এটাই হল সেই প্রাথমিক সময়, যে সময়ে চাঁদ 'নতুন চাঁদ' পশ্চিমাকাশে দীপ্তিমান হয় এবং দুনিয়ার লোকেদের দৃষ্টি তা দেখার অভিলাষী থাকে। যদি মেঘ, ধূলাবালি, কুয়াশা বা অন্য কিছু দেখার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই শিশুপ্রতিম চন্দ্রকে প্রদীপ্ত দেখতে না পাওয়ার কোনই কারণ নেই।

লক্ষ্য করুন, এ হল আযমগড়ের চাঁদের উদয়স্থল। এখন আযমগড়ের পশ্চিমে করাচি, মক্কা মুআয্যামা, কায়রো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও কানারিয়ার বাসিন্দা সকলেই নিঃসন্দেহে চাঁদ দেখতে পাবে; যদি দেখার কোন বাধা না থাকে। পার্থক্য এই যে, আমরা আযমগড়ে সূর্যাস্তের সময় যদি ৬টার সময় চাঁদ দেখি, তাহলে করাচিতে ৭টা ৫ মিনিটে, মক্কায় ৮টা ৫২ মিনিটে, কায়রোতে ৯টা ২৭ মিনিটে, তিউনিসিয়া (আফ্রিকায়) ১০টা ৫২ মিনিটে এবং আলজেরিয়া-কানারিয়া (পশ্চিম আফ্রিকায়) ১২টা ৪৫ মিনিটে (সঠিক হিসাবে ১১টা ২১ মিনিটে) (যখন আযমগড়ে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে) সূর্যাস্তের সময় নতুন চাঁদ পরিদৃষ্ট হবে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম দিকের লোকেরা আমাদের পূর্ব দিকের লোকেদের চাইতে চাঁদকে বেশি বড় আকারে এবং সূর্য থেকে বেশি দূরত্বে দেখতে পাবে। এখন যেহেতু চাঁদ আকাশে বিদ্যমান আছে, এই জন্য উপর্যুক্ত শহরবাসীরা যদি নিজেদের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার কারণে দিন থাকতেই চাঁদ দেখে নেয়, তাহলে তা আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে তা তাদের জন্য বড় কঠিন।

আচ্ছা, এখন যদি আরো একটু অগ্রসর হন, তাহলে নিউয়ার্কে (পূর্ব আমেরিকায়) ৪টা ২৯ মিনিটে এবং (পশ্চিম আমেরিকা) ওয়াশিংটনে ৭টা ৩৩ মিনিটে (সেখানে) সূর্যাস্তের সময় নতুন চাঁদ নজরে আসবে। (তখন আযমগড়ে সূর্য উদিত হয়ে যাবে।) কিন্তু তাদের চাঁদ আলজেরিয়া-কানারিয়া-ওয়ালাদের

থেকে বেশি বড় এবং সূর্য থেকে বেশি দূরত্বে নজরে আসবে। তারা যদি দিনে চাঁদ দেখে নেয়, তাহলে তা দেখতে পারে, কিন্তু তবুও তা কঠিন হবে।

এখন এখান থেকে এ সমস্যার সমাধানও গ্রহণ ক'রে নিন যে, চাঁদের দর্শন দ্বিপ্রহরের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের পরেও সম্ভব। যেহেতু সে সময়ে চাঁদ আকাশে বিদ্যমান থাকে (সূর্যের আলোর ফলে তা উজ্জ্বল হয়ে নজরে পড়ে না।) এবং আগামী রাতে তা নতুন চাঁদ হিসাবে প্রকাশ হওয়ার কথাও স্পষ্ট।

আচ্ছা, আমেরিকা অতিক্রম ক'রে যদি আরো একটু অগ্রসর হন তাহলে জাপানের টোকিওতে ২টা বেজে ১৮ মিনিট (তখন আযমগড়ে দুপুরের পরবর্তী সময়) এবং আরো অগ্রসর হলে বর্মা শহরে ৫টা বেজে ৮ মিনিটে সূর্য অস্ত যাবে। (তখন আযমগড়ে সূর্য ডুবতে ৫২ মিনিট বাকী থাকবে।) সেই সময় সেখানে চাঁদ দেখা যাবে এবং তাদের চাঁদ তুলনামূলক যথেষ্ট বড় ও সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরত্বে অবস্থান করবে। ওরাই সেই লোক, যারা দিনের বেলায় অতি সহজে চাঁদ দেখতে পারে; বিশেষ ক'রে বর্মা শহরবাসী। কেননা, তাদের নতুন চাঁদ সবার চাইতে বড় দেখা যাবে এবং সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৪/৩,২৩) দূরত্বে থাকবে। কিন্তু এ চাঁদের আগামী রাতের চাঁদ হওয়ার কথা তো স্পষ্ট, কিন্তু সূর্যাস্তের সময় যখন তারা চাঁদ দেখে তখন কেউ বলে, 'এ চাঁদ গত কালের।' কেউ ধারণা করে, এ চাঁদ গত পরশুর। নিরক্ষর নবী ﷺ-এর প্রতি কুরবান হন। তিনি বলেন, "না-না। তোমাদের ধোঁকা হচ্ছে। এ তো আজকেরই চাঁদ।"

عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ – قَالَ – تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ أَىَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ ».

আবুল বাখতারী (তাবেঈ) বলেন, একদা আমরা উমরা করতে বের হলাম। অতঃপর যখন আমরা বাতনে নাখলা নামক জায়গায় (বিশ্রাম নেওয়ার জন্য) নামলাম, তখন নতুন চাঁদ দেখলাম। তা দেখে কিছু লোক বলল, 'এটা পরশু দিনের চাঁদ।' কিছু লোক বলল, 'এটা গত কালের চাঁদ।' অতঃপর আমরা

ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললাম, 'আমরা নতুন চাঁদ দেখলাম। তা দেখে কিছু লোক বলল, 'এটা পরশু দিনের চাঁদ।' কিছু লোক বলল, 'এটা গত কালের চাঁদ।' তিনি বললেন, 'তোমরা কোন্ রাত্রে চাঁদ দেখেছ?' আমরা বললাম, 'অমুক রাত্রে (অর্থাৎ, ত্রিশের রাত্রে)।' তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ চাঁদ দেখার সময় নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা যে রাতে দেখেছ, সে রাতেরই চাঁদ।"

অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে আব্বাস বললেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ চাঁদ দেখার সময় নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা যে রাতে দেখেছ, সে রাতেরই চাঁদ।" (৮৮)

সুতরাং চাঁদ ছোট হোক বা বড়, তা দেখার বিষয় নয়।

সারকথা এই যে, আযমগড়ের আকাশে যখন নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন তার পশ্চিমে আপনি যত দূরই যাবেন, সেখানকার দেশ, শহর বা কোন জনপদ এমন থাকবে না যে, সেখানকার আকাশে চাঁদের অস্তিত্ব থাকবে না। এটা ভিন্ন কথা যে, সাময়িক কোন কারণে সেখানকার বাসিন্দাগণ চাঁদ দেখতে পায় না। একেই বলে দর্শন-ভিন্নতা। সুতরাং যদি চাঁদের সঠিক প্রমাণ মিলে যায়, তাহলে শরয়ী নির্দেশ জারী হবে, নচেৎ না। এ ব্যাপারে কারো মতানৈক্য নেই। এখানে এ কথাও প্রমাণিত হল যে, পূর্ব দিকের দেশবাসীদের দর্শন পশ্চিম দিকের দেশবাসীদের ক্ষেত্রে দর্শন সুনিশ্চিত প্রমাণিত হবে। এই জন্য পূর্ব দিকের কোন দেশে চাঁদ দেখার সঠিক প্রমাণ ও সূত্র পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে (পশ্চিমের দেশগুলিতে) শরয়ী নির্দেশ জারী হবে। আর এ কথাও জানা গেল যে, চাঁদের ছোট-বড় হওয়া কিছুর দলীল নয়, চাহে তা ২৯ তারীখের হোক অথবা ৩০ তারীখের।

এবারে আমরা উদয়স্থল ভিন্নতার কথা বুঝাবার চেষ্টা করব। সুতরাং সেখান থেকেই হিসাব শুরু করুন, যখন আযমগড়ে ৬টা বাজার কিছু সেকেন্ড পূর্বে চাঁদ সূর্য থেকে ১৩ ডিগ্রি দূরে উজ্জ্বল ধনুকের আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। এবার আযমগড়ের পূর্বে একটু অগ্রসর হন। কিন্তু ১২ ডিগ্রির বেশি নয়; যেমন পাটনা, ভাগলপুর, ঢাকা, সিলেট, মণিপুর (আসাম)। যখন আযমগড়ে চাঁদ প্রকাশ পেল, তখন ঐ চাঁদ উক্ত শহরগুলির আকাশেও বিদ্যমান আছে।

(৮৮) সহীহ মুসলিম ২৫৮১নং

পর্যায়ক্রমে সেখানকার চাঁদ সেখানকার লোকেদের পশ্চিম দিগন্তের নিকট থেকে নিকটতর হওয়ার ফলে তাদের নজরে প্রকাশ পাবে না। উক্ত শহরগুলির মধ্যে মণিপুর সবচেয়ে দূরবর্তী এবং আযমগড় থেকে ১০ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। তাদের চাঁদ দিগন্ত থেকে এত নিকটবর্তী হবে যে, কেবল ৫ মিনিট দিগন্তে অবস্থান ক'রে অস্ত যাবে। এখন ঐ শহরবাসীদের নিকট যদি চাঁদের সঠিক প্রমাণ পৌঁছে, তাহলে শরয়ী নির্দেশ কার্যকর হবে। আর এ নির্দেশ আমাদের আনুমানিক ১২ ডিগ্রি দর্শন-ধনুর ভিত্তিতে আযমগড় থেকে কেবল ১২ ডিগ্রি পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর হবে।

আচ্ছা, এবারে ১২ ডিগ্রি থেকে অগ্রসর হয়ে ১৩ ডিগ্রির উপর দাঁড়িয়ে যান। এখন যেহেতু আযমগড়ে ১২ ডিগ্রি উচ্চতায় চাঁদ অবস্থিত, আর আপনি আযমগড় থেকে ১২ ডিগ্রি পূর্বে সরে গিয়ে ১৩ ডিগ্রির উপর পা রেখেছেন, এই জন্য চাঁদ দর্শন-ধনুতে পৌঁছনোর সাথে সাথেই আপনার দিগন্তের নিচে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বর্মা শহর, যা ৯৬ ডিগ্রি ১৩ মিনিট দ্রাঘিমারেখায় এবং আযমগড় থেকে ১৩ ডিগ্রি ৪৭ মিনিট পূর্বে অবস্থিত। যখন আযমগড়ের পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ উদিত হবে, তখন বর্মার দিগন্ত ১ ডিগ্রি ৪৭ মিনিট নিচে পৌঁছবে। সেই সময় বর্মার শহরবাসীদের জন্য কোন প্রকার যন্ত্র দ্বারাও চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না। বাস্, এই হল উদয়স্থলের ভিন্নতা। বর্মাবাসীর উদয়স্থল চাঁদশূন্য। এবারে যত পূর্বে যাবেন, হংকং, টোকিও, ওয়াশিংটন প্রভৃতি শহরে চাঁদ দেখতে পাবেন না। কারণ, সেখানকার উদয়স্থল চাঁদশূন্য।

এখান থেকেও এ কথা পরিষ্কার হয় যে, পশ্চিমের কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সেই অনুসারে পূর্বের দেশগুলিতে চাঁদ হওয়া আবশ্যক নয়। বরং কেবল ১২ ডিগ্রি পূর্বে আমাদের আনুমানিক দর্শন-ধনু পর্যন্ত এ বিধান নিশ্চিতভাবে কার্যকর করা যেতে পারে। তার পরে নয়। এ কথাও জানা গেল যে, উদয়স্থল-ভিন্নতা প্রমাণের জন্য মাঝামাঝি ১২ ডিগ্রি (আমাদের আনুমানিক দর্শন-ধনু)র ব্যবধান জরুরী, যার দূরত্ব ৮৩৩ মাইল বা ১৩৩২.৮ কিমি. হয়।" (৮৯)

উদয়স্থল-ভিন্নতার পরিচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই থেকে যায় যে, উদয়স্থল-ভিন্নতার সীমানার গণ্যতা কোন্ ভিত্তিতে করা হবে? এর জন্য কি কোন নির্দিষ্ট বিধি-নিয়ম আছে, যা উলামা অথবা দায়িত্বশীলদের সামনে

(৮৯) ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ১/৬৭০ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠারাজি

রাখা যাবে?

কেননা, যদি বলা হয় যে, চাঁদ দেখার জন্য উদয়স্থল বিবেচ্য, তাহলে তাতে একটা সমস্যা এই দেখা দেবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক আলেম বা প্রত্যেক শাসক এ কথা জানে না যে, যে জায়গায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হল, সে জায়গায় উদয়স্থলের সীমাবদ্ধতা কী? এই জন্য ব্যাপারটিকে একটি নির্দিষ্ট বিধি-নিয়মের গন্ডিতে আনা আবশ্যক। যাতে যখনই কোন জায়গায় চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যাবে, সে জায়গার লোক অথবা কম-সে-কম সেখানকার চারিপাশে বসবাসকারী অভিজ্ঞজনেরা এ কথা জানতে পারেন যে, অমুক অমুক এলাকার জন্য অমুক অমুক এলাকার চাঁদ দেখা গণ্য হবে এবং অমুক অমুক জায়গার জন্য গণ্য হবে না।[৯০]

এ ব্যাপারে লেখকের অভিমত এই যে, প্রত্যেক দেশে উলামা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রস্থলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে তা পৌঁছে দেওয়া হবে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের ভারত-পাকিস্তানের মাটি উক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে শূন্য নয়।

হালফিল আমার কাছে দুটি রায় গ্রহণযোগ্য, যা আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি। যার আলোকে অভিজ্ঞগণ কোন এক পরিণতিতে পৌঁছতে সক্ষম হন। আর এ রায় দুটি মওলানা আ'যমীর রায় থেকে পৃথক, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবে সর্বমোট তিনটি অবস্থা সামনে আসে। প্রকাশ থাকে যে, মক্কার 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী'র অধীনে কর্মরত কমিটি 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'তে বিষয়টি বারবার পেশ করা হয়েছে। তা হতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারা যায়।

প্রথম রায় ঃ-

'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী'র 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'র দ্বিতীয় অধিবেশনে ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ আল-ফুরফূর উদয়স্থল-ভিন্নতা ও তার শরয়ী অবস্থান সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পেশ করেছেন। যার পরিশিষ্টে এই রায় পেশ করেছেন যে, সারা বিশ্বকে তিনটি বড় বড় এলাকা (zone)এ ভাগ করা হোক এবং নিজ নিজ এলাকার দর্শন সেই এলাকার জন্য প্রামাণিক

[৯০] মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড, ৯০১-৯০২পৃঃ

মানা হোক।

১। আমেরিকা মহাদেশ একটি এলাকা। এতে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা, ক্যানাডা, ব্রাজিল এবং সে সব এলাকার সকল দ্বীপ-উপদ্বীপ শামিল।

২। মরক্কো থেকে আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত একটি এলাকা। যাতে শামদেশ, মিসর, সুডান ইত্যাদি সকল এলাকা শামিল।

৩। আরব উপসাগর থেকে জাপান পর্যন্ত একটি এলাকা। এতে জাপান ও তার আশেপাশের এলাকা শামিল।

দ্বিতীয় রায় ঃ-

মওলানা আব্দুর রহমান কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'উদয়স্থলের সীমানা' শিরোনামে লিখেছেন, "এবার আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, জ্যোতির্বিদ্যার নিরিখে আশেপাশের এলাকার সীমানাটা কী?

যদি চাঁদ ঠিক আমাদের মাথার উপর দীপ্তিমান থাকে, তাহলে আমরা তাকে ৯০ ডিগ্রি সমকোণের উচ্চতা নির্ধারণ করে থাকি। এই চাঁদ সাত দিনে পশ্চিমাকাশ থেকে মধ্যাকাশে পৌঁছে। অর্থাৎ, ৭ দিনে ৯০ ডিগ্রির দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আসে। কেননা, প্রত্যেক গোলাকার বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই জন্য আকাশে চাঁদের ডিগ্রি অনুসারে ব্যবধান এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ একই কথা।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা ভূগোলকের দ্রাঘিমারেখার ডিগ্রিসমূহের। একই দ্রাঘিমারেখার সমান্তরালে অবস্থিত সকল শহর ও দেশসমূহের চাঁদ ও সূর্যের উভয়ের উদয়স্থল এক হয়। যখন আমরা বলি যে, (ক) জায়গায় চাঁদ ৮১ ডিগ্রিকৌণিক উচ্চতায় দেখা গিয়েছে, তখন নিম্নোল্লিখিত ফলাফল গ্রহণ করতে পারি ঃ-

এক ঃ এই চাঁদ সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পরে অস্ত যাবে। দিগন্তে লাল আভা থাকার কারণে মাগরেবের নামাযের পরেই দেখা যেতে পারে।

দুই ঃ পশ্চিম দিকে এই চাঁদের উদয়স্থল সীমাহীন এবং পশ্চিমাঞ্চলে এই চাঁদ দেখা যাওয়ার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত।

তিন ঃ পূর্ব দিকে এর উদয়স্থলের সীমানা ৫ ডিগ্রি অতিরিক্ত পূর্ব দ্রাঘিমারেখার দূরত্ব হবে। কেননা, ১৩ ডিগ্রির চাঁদ দৃশ্যমান নয়।

পাঁচ ডিগ্রি পূর্বে অবস্থিত (গ) জায়গাতে চাঁদ দৃশ্যমান হবে। আর ৫ ডিগ্রির দ্রাঘিমারেখার পূর্ব-পশ্চিম সমান্তরাল দূরত্ব নিম্নরূপ ঃ-

ক। বিষুব রেখার উপর ৬৯,১/২X৫ মাইল = ৩৪৭,১/২ মাইল বা ৫৫৫.২৮ কিমি. সোজা পূর্বে হবে।

খ। মকরক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি রেখার উপর ৬৭X৫=৩৩৫ মাইল বা ৫৩৬ কিমি. সোজা পূর্বে হবে।

গ। ৬৬,১/২ ডিগ্রি কুমেরু বৃত্ত বা সুমেরু বৃত্তের উপর প্রায় ৫X৪৬=২৩০ মাইল বা ৩৬৮ কিমি. সোজা পূর্বে হবে।

ঘ। ৬৬,১/২ ডিগ্রির উপরের জায়গাসমূহে চন্দ্র-দর্শনের উপর একেবারে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে।

এই হল সেই দূরত্ব, যাকে অভিন্ন উদয়স্থলের সীমারেখা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এতে সেই দূরত্বও শামিল, যেখানকার লোকেরা চাঁদ দেখে থাকে এবং সেই দূরত্বও শামিল, যেখানকার লোকেরা চাঁদ দেখতে পারে।

উদয়স্থলের সীমানার ব্যাপারে সলফগণের উক্তিতে বহু মতভেদ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড-টাইম নির্ধারণ উক্ত সমস্যার যথেষ্ট সমাধান পেশ করেছে। কয়েকটা ইসলামী দেশে সারা দেশের স্ট্যান্ডার্ড-টাইম একই হয়ে থাকে, চাহে তার দূরত্ব ১৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা থেকে বেশি হয়। যেমন সউদী আরব ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৫৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখার উপর অর্থাৎ ২১ ডিগ্রির উপর বিস্তীর্ণ আছে। কিন্তু সারা দেশের স্ট্যান্ডার্ড-টাইম একটাই। অর্থাৎ গ্রিনিচ-মান সময়ের ৩ ঘন্টা আগে। চাঁদ দেখার জন্য কমিটি গঠন করে সরকার, সেই কমিটি সাক্ষ্য-সত্যায়নের পর চাঁদ দেখার কথা ঘোষণা করে এবং তা সারা দেশের জন্য দর্শন নির্ধারণ করা হয়। যার অর্থ হল এই যে, এই সরকার সারা দেশের জন্য একটাই উদয়স্থল নির্ধারিত ক'রে মতভেদ দূর ক'রে দিয়েছে।

এমনই অবস্থা ভারতের, যার দ্রাঘিমারেখা ৭০ থেকে ৮৯ অর্থাৎ, ১৯ ডিগ্রি। সেখানেও অভিন্ন একটাই স্ট্যান্ডার্ড-টাইম আছে এবং সেখানকার দর্শনও সারা দেশের জন্য অভিন্ন দর্শন। অবশ্য কিছু দেশ এমন আছে, যা অনেক বেশি ডিগ্রি জুড়ে বিস্তীর্ণ আছে। যেমন চীন, রাশিয়া ও কানাডা, এ দেশগুলির বিভিন্ন এলাকায় স্ট্যান্ডার্ড-টাইমও ভিন্ন ভিন্ন, অনুরূপ উদয়স্থলও।[৯১]

[৯১] আশ-শামসু অল-ক্বামারু বিহুসবান, মাজাল্লাতুদ দা'ওয়াহ খন্ড ১৪, সংখ্যা ১২৫, ৮৩পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়

অভিন্ন দর্শন

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলিমদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয় চান্দ্র মাসের সাথে দায়বদ্ধ এবং চান্দ্র মাস জানার সঠিক উপায় হল চন্দ্র দর্শন। এই জন্য শরীয়ত চন্দ্র দর্শনের প্রতি বড় গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কথা ও কাজে চন্দ্র দর্শনের প্রতি উৎসাহ ও তাকীদ পাওয়া যায়। এই জন্য চান্দ্র মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করার ব্যাপারে নির্ভর হল একমাত্র চন্দ্র দর্শন।

চন্দ্র দর্শনের ব্যাপারে এটাও একটি ইল্মী (ভৌগোলিক) প্রকৃতত্ব যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটা বাস্তবতা। আর এটা শুধু ইল্মী প্রকৃতত্বই নয়, বরং এটা একটা অনায়াসবোধ্য বিষয়। এই কারণে উম্মতের উলামাগণ একমত হয়ে উদয়স্থল-ভিন্নতাকে স্বীকার করেন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভের পর এখন প্রশ্ন আসে যে, মুসলিমদের দ্বীনী ব্যাপারসমূহ; বিশেষ ক'রে রোযা, ঈদ, হজ্জ, কুরবানী প্রভৃতির ব্যাপারে অভিন্ন দর্শনের গণ্যতা আছে, নাকি নেই? অর্থাৎ, বিশ্বের কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে কি সেই দেখা সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট? নাকি প্রত্যেক এলাকা ও দেশবাসীকে নিজ নিজ এলাকা ও দেশে চাঁদ দেখার ব্যবস্থা নিতে হবে?

এ অধ্যায়ে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। বরং এই পুস্তিকার মৌলিক বিষয় সেটাই।

অভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তিসমূহের অবিশদ বিবরণ

মৌলিকভাবে বিষয়টির ব্যাপারে দুটি মত আছে ঃ-

এক ঃ উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি ইল্মী প্রকৃতত্ব। কিন্তু রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে তার গণ্যতা নেই। বরং এক জায়গার দর্শন সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই অভিমত পোষণকারী উলামাগণের অধিকাংশের রায় এই যে, দুনিয়ার কোন স্থানে যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের জন্য তা

যথেষ্ট। বলা হয় যে, এটাই অধিকাংশ উলামার রায়।[৯২]

পরবর্তীকালের কিছু উলামার রায় হল, সারা বিশ্বের জন্য মক্কাবাসীর দর্শন গণ্যতা পাবে। আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) এই রায়ের উপর খুব জোর দিয়েছেন।[৯৩]

দুই ঃ অভিন্ন দর্শনের দর্শন সঠিক নয়। বরং দূরত্ব হিসাবে চাঁদ দেখার ব্যাপারে পার্থক্য একটি বাস্তব ও অনায়াসবোধ্য বিষয়। অতঃপর কতটা দূরত্বের মধ্যে দর্শন-অভিন্নতা গণ্য হবে এবং তার বাইরে হবে না? এ ব্যাপারে উলামাগণের বিভিন্ন উক্তি আছে ঃ-

১। যে এলাকার উদয়স্থল এক, সে এলাকার সীমানায় অভিন্ন দর্শন গণ্যতা পাবে। পক্ষান্তরে উদয়স্থল ভিন্ন হলে দর্শন-ভিন্নতাও অনিবার্য।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র, ইমাম খাত্ত্বাবী, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এবং সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের একটি বড় জামাআতের এটাই রায়। বরং অত্র পুস্তিকার লেখকের তাহক্বীক্ব (সত্যানুসন্ধিৎসা) অনুযায়ী অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও হাদীস-ব্যাখ্যাতাগণের রায়ও সেটাই।[৯৪]

২। যত দূর অবধি বিনা বাধায় চাঁদ দেখা সম্ভব, তত দূর অবধি অভিন্ন দর্শন গণ্যতা পাবে। তার বাইরে নয়।

এ রায় হল ইমাম সারাখসীর।[৯৫]

এই রায় পূর্বোক্ত উদয়স্থল-ভিন্নতার রায়ের কাছাকাছি। কেবল বাগ্‌ধারার পার্থক্য। এই অর্থেই প্রাচীন উলামাগণের এক উক্তি, 'লিকুল্লি বালাদিন রু'য়াতুহুম'। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

৩। যতটুক দূরে গিয়ে নামাযের কসর বৈধ হয়, তত দূর পর্যন্ত দর্শন-অভিন্নতা গণ্য হবে। তার বাইরে নয়।

এ মত হল খুরাসানের শাফেয়ী উলামা এবং কিছু হাম্বলীর।[৯৬]

---

(৯২) তামামুল মিন্নাহ ৩৯৮পৃঃ

(৯৩) দেখুন ঃ আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র পুস্তিকা 'আওয়াইলুশ শুহূরিল আরাবিয়্যাহ' ২১পৃঃ

(৯৪) আত্-তামহীদ ১৪/৩৫৮, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ ১০৬পৃঃ, আল-মাজমূ ৬/২২৭

(৯৫) ফাতহুল বারী ৪/১২৩, আল-মিরআত ৬/৪২৬

(৯৬) আল-আলামুল মানশূর ২৮পৃঃ, আল-মাজমূ' ৬/২২৭, ফাতহুল আল্লাম ৪/১৬

৪। এক অঞ্চল জুড়ে দর্শন-অভিন্নতা গণ্য হবে। এক অঞ্চলের দর্শন অন্য অঞ্চলের জন্য গণ্য হবে না।

হানাফীদের মধ্যে হুসাইন বিন আলী স্বাইমারী (মৃত্যু ৪৩৬হিঃ) এবং কিছু শাফেয়ীর রায় এটাই।[৯৭]

৫। একই রাষ্ট্রনেতার অধীনস্থ দেশে দর্শন-অভিন্নতা গণ্য হবে। অন্যথা নয়।

প্রসিদ্ধ মালেকী ফক্বীহ ও ইমাম আব্দুল মালেক বিন মাজেশূনের রায় এটাই।[৯৮]

বর্তমান বিশ্বের ফক্বীহ আল্লামা ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) সামাজিক (বা একই দেশের জনগণের মাঝে ঐক্যের) দৃষ্টিভঙ্গিতে এই রায়কেই শক্তিশালী বলেছেন।[৯৯]

৬। যদি দুই শহরের মাঝে এতটা দূরত্ব হয় যে, একটাতে যোহরের সময় এবং অপরটাতে আসরের সময় হয়; অর্থাৎ, দুই শহরে একই সময়ে দুই নামাযের সময় হয়, তাহলে দর্শন-অভিন্নতা প্রযোজ্য নয়।[১০০]

৭। রাতারাতি যত দূরে খবর পৌঁছানো সম্ভব হয়, তত দূর অবধি দর্শন-অভিন্নতা গণ্য হবে, তার বাইরে নয়।[১০১]

(বর্তমান যুগে এ রায় প্রথমোক্ত রায়ের অনুরূপ। কারণ, বর্তমানে রাতারাতি নয়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সারা বিশ্বে খবর পৌঁছানো অতি সহজ।)

রায়সমূহের বিশদ বিবরণ ও তার দলীলাদি নিয়ে সমীক্ষা

দর্শন-অভিন্নতার দলীলসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, দর্শন-অভিন্নতার ব্যাপারে (বা এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে তা সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট---এ মর্মে) কোন স্পষ্ট দলীল কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান নেই। কেবল কিছু আয়াত ও হাদীসের ব্যাপক ভাষ্য থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়। নিম্নে এ মতের সপক্ষে দলীলসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ-

১। কুরআন থেকে দলীল ঃ

---

(৯৭) আল-আলামুল মানশূর ২৭পৃঃ, আল-মাজমূ' ৬/৩৩৭, ফাতহুল বারী ৪/১২৩

(৯৮) ত্বারহুত্ তাষরীব ৪/১১৬, আল-আলামুল মানশূর ৩৭পৃঃ)

(৯৯) আশ্-শারহুল মুমতে' ৬/৩২৩

(১০০) মাজাল্লাতুল ই'তিস্বাম ৪৭/৩

(১০১) আশ্-শারহুল মুমতে' ৬/৩২৬

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٨٥) سورة البقرة

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

উক্ত আয়াত থেকে দলীল এভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এখানে উম্মতের সকলকে সম্বোধন করেছেন। মাস পাওয়া অথবা চাঁদ দেখে নেওয়াকেই রোযা রাখার হেতু নির্ধারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ না বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন, আর না কোন বিশেষ এলাকার মুসলিমকে এ আদেশ করেছেন। বরং এ বিধান আম ও ব্যাপক, যা সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য। অতঃপর যখন এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, মুসলিমদের প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদ দেখা শর্ত নয়, বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, চাঁদ দেখার খবর পৌঁছলেই উম্মতের যে যে ব্যক্তির কাছে সে খবর পৌঁছবে, সে সে ব্যক্তির জন্য রোযা বা ঈদ করা ফরয হবে।

কিন্তু উক্ত দলীল গ্রহণে একটি বড় আপত্তি এই যে, মহান আল্লাহ রোযা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারটা চাঁদ দেখে অথবা গণনায় মাস ৩০ দিন পূরণ ক'রে মাস প্রবেশ করার সাথে দায়বদ্ধ করেছেন; চাহে সে দর্শন প্রকৃত হোক অথবা প্রকৃতসম (মানগত)। অর্থাৎ, একজন মুসলিম নিজে চাঁদ দেখে অথবা সে এমন জায়গায় থাকে, যে জায়গার লোকেরা চাঁদ দেখে। প্রথম পরিস্থিতিতে এই বলা যাবে যে, সে আসলেই চাঁদ দেখেছে। আর দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে বলা যাবে যে, সে চাঁদ দেখার মানগত অবস্থানে আছে। অর্থাৎ, যদি কোন প্রকাশ্য বাধা না থাকত, তাহলে সে ব্যক্তিও বাস্তবে চাঁদ দেখতে পেত। এখন প্রশ্ন হল যে, যে ব্যক্তি এমন জায়গায় থাকে, যার উদয়স্থল ভিন্ন অথবা অন্য কোন কারণে চাঁদ উদয়ই হল না, তাহলে সেই জায়গায় সে ব্যক্তি না প্রকৃতপক্ষে চাঁদ দেখে, আর না-ই মানগত দিক থেকে চাঁদ দেখার অবস্থানে থাকে। সুতরাং কীভাবে বলা যাবে যে, সে "তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।"---এই নির্দেশে শামিল? যেহেতু তার নিকট মাস পাওয়াটা না প্রকৃতভাবে, আর না মানগতভাবে প্রমাণিত।

(বলা বাহুল্য, উক্ত নির্দেশ ব্যাপক নয়। যেহেতু আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে---" তার মানে আয়াতের উদ্দেশ্য সারা উম্মত নয়, বরং কেবল তারা, যাদের কাছে এ মাস প্রমাণিত হবে।)

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রসূল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ছিল এর বিপরীত। যেহেতু নবী ﷺ-এর জীবনে ৯ বার রমযান এসেছে, কিন্তু কোন রমযানের ব্যাপারে সহীহ বা যয়ীফ সনদে এ কথার উল্লেখ আসেনি যে, মদীনা মুনাওয়ারার চাঁদ দেখার খবর (অন্য এলাকার) লোকেদের মাঝে প্রেরণ করেছেন অথবা তিনি চাঁদ দেখার ব্যাপারে অন্য এলাকার লোকেদের কাছে খবর নিয়েছেন। এই আমলই খুলাফায়ে রাশেদীন ﷺএর ছিল। এই জন্য ভাববার বিষয় যে, একই জায়গার দর্শন যদি প্রত্যেক জায়গার জন্য যথেষ্ট হতো, তাহলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সে খবর প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হতো অথবা অনাগত উম্মাহর জন্য তার স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেওয়া হতো।[১০২]

তৃতীয়তঃ একাধিক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে কিছু এলাকায় চাঁদের প্রমাণ মিলত এবং অন্য কিছু এলাকায় চাঁদের প্রমাণ মিলত না। তার খবর দ্বিতীয় এলাকায় পৌঁছেও যেত, কিন্তু কোন সাহাবী বা তাবেঈ লোকেদেরকে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করার হুকুম দিতেন না।[১০৩]

২। হাদীস থেকে দলীল ঃ

(ক) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)).

অর্থাৎ, যখন তোমরা চাঁদ দেখো, তখন রোযা (শুরু) কর এবং (২৯ তারীখে) যখন তোমরা চাঁদ দেখো, তখন রোযা ছাড়ো। অতঃপর যদি (২৯ তারীখের সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে তার অনুমান কর (অর্থাৎ ৩০ দিন পূর্ণ ক'রে নাও)।[১০৪]

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি প্রায় একই, যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ হাদীসের সম্বোধন আম ও ব্যাপক সকল উম্মতের জন্য। আল্লাহর রসূল ﷺ কেবল মদীনাবাসীকেই সম্বোধন করেননি, বরং সকল মুসলিমদেরকে সম্বোধন করেছেন। এই জন্য কোনও জায়গায় চাঁদ প্রমাণিত হলে সকল মুসলিম সেই

(১০২) তিব্‌য়ানুল আদিল্লাহ ৭পৃঃ, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/ ৪৬
(১০৩) মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/ ১০৮, তামহীদ ১৪/৩৫৮
(১০৪) বুখারী ১৯০০, মুসলিম ২৫৫৬নং

অনুযায়ী আমল করবে।[১০৫]

এই দলীলের ব্যাপারেও একই আপত্তি রয়েছে, যেমন এর পূর্বের দলীলের ব্যাপারে ছিল। অর্থাৎ, এই হাদীসে সম্বোধিত লোক তারাই, যারা প্রকৃতপক্ষে অথবা মানগত অবস্থানে চাঁদ দর্শন করেছে। সুতরাং যারা প্রকৃতপক্ষে বা মানগতভাবে চাঁদ দেখে ধন্য হয়নি, তারা এ নির্দেশের শামিল হয় কীভাবে? যেমন যে শহরে জুমআর আযান হয়, সে শহরের লোকেদের জন্য জুমআয় উপস্থিতি জরুরী। কিন্তু যে শহরে এখনও জুমআর সময়ই হল না, সে শহরের লোকদেরকে জুমআয় উপস্থিত হওয়ার আদেশ কীভাবে করা যায়? এই জন্য সঠিক এটাই যে, উক্ত হাদীস এবং অনুরূপ সকল হাদীসের নির্দেশ আম ও ব্যাপক। যাকে উদয়স্থল-ভিন্নতার আলোচনায় উল্লিখিত দলীলসমূহ খাস ও সীমাবদ্ধ করেছে।

(খ) প্রসিদ্ধ তাবেঈ রিব্‌ঈ বিন হিরাশ এক সাহাবী[১০৬] থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার মদীনা মুনওয়ারায় রমযানের শেষের দিকে মতভেদ হল। (যেহেতু আকাশ পরিষ্কার ছিল না এই জন্য লোকেদের আপোসে তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল।) ইতিমধ্যে দুই বেদুঈন সেখানে উপস্থিত হল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা চাঁদ দেখেছে। সুতরাং নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, লোকেরা রোযা ইফতার করে নিক এবং আগামী কাল ঈদগাহের জন্য বের হোক।[১০৭]

এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের পদ্ধতি এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মদীনা মুনাওয়ারার বাইরের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করলেন। যাতে স্পষ্ট হয় যে, এক জায়গার দর্শন অন্য জায়গায় গ্রহণযোগ্য এবং প্রামাণ্য বটে।

কিন্তু এ দলীল গ্রহণের উপরেও আপত্তি এই যে, সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা এবং পরদিন চাশ্‌তের সময় মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে যাওয়ায় এমন কোন দূরত্ব

(১০৫) মাজমূউ ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায ১৫/৭৯, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৫০

(১০৬) উক্ত সাহাবীর নাম আবূ মাসঊদ উক্ববা বিন আমের বাদরী; যেমন মুস্তাদরাকুল হাকেম ১/৩৯৭এ স্পষ্ট আছে।

(১০৭) আবূ দাঊদ ৩৩৪০নং, আহমাদ ৫/৩৬২, ৪/৩১৪, দারাকুত্বনী ৩/ ১৬৯, ইমাম দারাকুত্বনী বলেছেন, এর সনদ হাসান ও প্রমাণিত। আরো দেখুন ঃ সহীহ আবূ দাঊদ ৩/৫৪

প্রমাণ হয় না, যার ফলে উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। আর না-ই এই দূরত্ব সেই দূরত্ব, যাকে পরিভাষায় 'দূর' বলা হয়। বরং (মদীনা থেকে মরুভূমি) মাত্র কয়েক মাইলের দূরত্ব থেকে থাকবে। যেহেতু সে যুগের মুসাফির সাধারণতঃ রাত্রের শেষাংশে যাত্রা-বিরতি গ্রহণ করত। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে এ হাদীস দর্শন-অভিন্নতার দলীল নয়, বরং অন্য এক মাসআলার দলীল। অর্থাৎ কোন এলাকায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে চাঁদ দেখা না গেলে পরের দিন কোন নিকটবর্তী (একই উদয়স্থলভুক্ত) এলাকা থেকে চাঁদ হওয়ার কথার সত্যায়ন পাওয়া যায়, তাহলে ঐ দর্শনের গণ্যতা হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে।

(গ) হযরত উমার ﷺ একদা চাঁদ দেখার জন্য বাইরে গেলেন। সম্মুখে এক আরোহীকে আসতে দেখলেন। হযরত উমার ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোত্থেকে আসছ?' সে বলল, 'শাম দেশ থেকে।' হযরত উমার ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি চাঁদ দেখেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' এ কথা শুনে হযরত উমার ﷺ বললেন,

الله أكبر، يكفي المؤمنين أحدهم.

অর্থাৎ, আল্লাহু আকবার! মুসলিমদের এক ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট।[১০৮]

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি হল এই যে, হযরত উমার ﷺ এক ব্যক্তি দর্শনকে সারা মুসলমানদের দর্শন গণ্য করলেন। উদয়স্থলের ভিন্নতা বা অন্য কোন পার্থক্যের কথা উল্লেখ করলেন না। বরং হাদীসের বাগ্‌ধারা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঐ ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে কোন জায়গায় চাঁদ দেখেছিল।

কিন্তু এ দলীল গ্রহণের উপর আপত্তি এই যে, প্রথমতঃ এ হাদীসটি যয়ীফ। কেননা, এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এক বর্ণনাকারী আব্দুল আ'লা ষা'লাবীর ব্যাপারে উলামাগণের সমালোচনা আছে। বরং ইবনে আবী হাতেম ও ইমাম নাসাঈ প্রমুখ উলামা তাকে প্রমাণ-অযোগ্য গণ্য করেছেন।[১০৯] পরন্তু হযরত উমার ﷺ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলার

(১০৮) আহমাদ ১/২৯, ৩০৭নং, আবূ য়্যা'লা, হাকেম, দারাকুত্বনী ৩/ ১৬৮- ১৬৯, বাইহাক্বী ৭৯৮১নং

(১০৯) তাহযীবুত তাহযীব ৬/৫৪-৫৫

সাক্ষাৎ হযরত উমার ﷺ-এর সাথে প্রমাণিত নয়।[১১০]

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে দূর-দূরান্ত থেকে আসা কোন মুসাফিরের সাক্ষির কথা উল্লেখ নেই। স্পষ্ট যে, হযরত উমার ﷺ চাঁদ দেখার জন্য ঘর থেকে (বাকী'র দিকে) বের হলেন, সেই সময়েই এক মুসাফিরকে (শহরের বাইরে থেকে) পথে আসতে দেখলেন, যে হযরত উমার ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের আগেই চাঁদ দেখে ফেলেছিল। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)).

অর্থাৎ, রোযা, যেদিন তোমরা রোযা রাখো। ইফতার, যেদিন তোমরা ইফতার কর এবং কুরবানী, যেদিন তোমরা কুরবানী কর।[১১১]

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি এই যে, এই হাদীসে সমস্ত মুসলিমদেরকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, 'তোমাদের রোযা রাখা, ঈদ করা ও কুরবানী করার দিন এক হওয়া উচিত।'[১১২]

কিন্তু এ দলীল গ্রহণে আপত্তি নিম্নরূপ ঃ-

প্রথমতঃ এটা একটা ব্যাপক নির্দেশ। যার উদ্দিষ্ট হল সেই লোকেরা, যাদের কাছে শরয়ী দর্শনের ভিত্তিতে রোযার দিন অর্থাৎ ১লা রমযান, ঈদের দিন অর্থাৎ ১লা শওয়াল এবং কুরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ই যুলহজ্জ প্রবেশ করেছে। আর যে এলাকা বা দেশবাসীর নিকট শরয়ীভাবে অর্থাৎ চাঁদ দেখার মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত রমযান মাস প্রবেশ করেনি, বরং এখনো সেখানে শা'বানের ২৮ বা ২৯ তারীখ, একইভাবে রমযানের ২৮ বা ২৯ তারীখ এবং যুলহজ্জের ৮ বা ৯ তারীখ, সে এলাকার লোকদিগকে রমযানের রোযা, ঈদ ও ১০ম যুলহজ্জের কুরবানী করার নির্দেশ কীভাবে দেওয়া যেতে পারে? ঠিক সেভাবেই, যেভাবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে রোযাদারকে ইফতারী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পরিষ্কার কথা যে, এ নির্দেশ কেবল সেই লোকেদের উপর প্রযোজ্য

(১১০) দেখুন ঃ আত্-তা'লীক্বুল মুগনী ৩/ ১৬৯, তাহক্বীক্বুল মুসনাদ ১/৩২৪

(১১১) আবূ দাউদ ২৩২৬, তিরমিযী ৬৯৭নং এবং শব্দাবলী তাঁরই, ইবনে মাজাহ ১৬৬০নং

(১১২) মাজমূউ ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায ১৫/৭৮

হবে, যাদের আকাশে সূর্য ডুবে গেছে বা ফজর উদয় হয়েছে। আর যাদের আকাশে এখনো সূর্য ডোবেনি বা ফজর উদয় হয়নি, তাদের জন্য সে নির্দেশ নয়। অনুরূপভাবে যে এলাকায় রমযান প্রবেশ করেনি, শওয়ালের চাঁদ উদয় হয়নি ইত্যাদি, সে এলাকার লোকেদেরকে ঐ ব্যাপক নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত কীভাবে করা যেতে পারে? ভেবে দেখুন, শরীয়তে কি এর অন্য কোন উদাহরণ আছে, যার উপর একে অনুমান করা যাবে?

দ্বিতীয়তঃ হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ উক্ত হাদীসের যে ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, তা আদৌ গৃহীত অর্থের সাথে মিলে না। বলা বাহুল্য, আমার জানা মতে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে উলামাগণের দুই শ্রেণীর কথা আছে ঃ-

(এক) রোযা, কুরবানী, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি মুসলিমদের এমন বিষয়, যার ব্যাপারে উম্মতের কারো একাকী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোন এখতিয়ার নেই। বরং সকল শহর বা দেশবাসী এবং মুসলিমদের জামাআতের যৌথ সিদ্ধান্তকে গোচরে রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি শওয়ালের চাঁদ দেখতে পায়, তার দেখার উপরে দৃঢ় প্রত্যয়ও থাকে, কিন্তু তার অন্য কোন এমন সাথী নেই, যে তার চাঁদ দেখার ব্যাপারে তাকে সমর্থন করে। এই জন্য বর্তমান শাসক বা শহরের আমীর বা কাযী অথবা মুসলিম জনসাধারণ তার দেখার কথা সত্যায়ন করে না, তাহলে তার জন্য জায়েয নয় যে, সে একাকীই ঈদ পালন করতে বের হয়ে যাবে। বরং মুসলিমদের জামাআতের সাথেই তাকে ঈদ পালন করতে হবে। খুব বেশি হলে সে এ কাজ করতে পারে যে, সে এককভাবে রোযা রাখবে না এবং ইফতারীর ঘোষণাও দেবে না। যদি শাসক, কাযী বা মুসলিম জনসাধারণ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে ইজতিহাদী ভুল করে, তাহলে সে ভুলের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের জন্য শিরোনাম বেঁধে বলেছেন,

باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

অর্থাৎ, কিছু আহলে ইল্ম এই হাদীসের ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, 'এর অর্থ

হল, রোযা ও ঈদ হবে জামাআত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের সাথে।'[১১৩]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের টীকায় লিখেছেন, বাহ্যতঃ এই হাদীসের অর্থে এই বুঝা যায় যে, উক্ত বিষয়সমূহে এককভাবে কোন ব্যক্তির কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। না কারো এ অধিকার আছে যে, উক্ত বিষয়সমূহে একাকী সক্রিয় হবে। বরং এ সকল বিষয় বর্তমান শাসক এবং মুসলিমদের জামাআতের দায়িত্বে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি একাকী চাঁদ দেখে, কিন্তু বর্তমান শাসক তার সাক্ষ্য রদ্দ ক'রে দেয়, তাহলে তার জন্য ওয়াজেব, এ ব্যাপারে মুসলিমদের জামাআতের অনুসরণ করে।[১১৪]

(দুই) যে সকল বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে এবং ইজতিহাদ সত্ত্বেও ভুল ঘটে বসে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, লোকেরা চাঁদ দেখার পুরো চেষ্টা করল, কিন্তু চাঁদ দেখা গেল না। যার ফলে মুসলিমরা শা'বানের ৩০ গুনতি পূরণ ক'রে রোযা রাখল। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল যে, শা'বানের মাস আসলে ২৯ দিনেরই ছিল এবং লোকেদের চাঁদ দেখতে ভুল হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাদের কোন গোনাহ হবে না এবং তাদের জন্য একটা রোযা কাযাও ওয়াজেব হবে না, যদি রমযান ২৮ দিনের না হয়। অনুরূপই মুসলিমরা যুলহজ্জের চাঁদ দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন কারণে চাঁদ দেখা গেল না। যার ফলে মুসলিমরা আরাফার ময়দানে ৯ এর বদলে ১০ যুলহজ্জে অবস্থান করল। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল যে, আসলে আরাফায় অবস্থান এক দিন পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। তাহলে এই শ্রেণীর ভুল হওয়ার কারণে হজ্জ প্রভাবিত হবে না। বরং সে হজ্জও পরিপূর্ণ এবং বিলকুল সঠিক গণ্য হবে। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত মাসরূক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদা আমি আরাফার দিন হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র খিদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'মাসরূককে ছাতু খাওয়াও

(১১৩) তিরমিযী ৩/৮০, আল্লামা বাদীউয যামান উক্ত বাবের অনুবাদে কী সুন্দরই না বলেছেন, বাব ঃ এ কথার বিবরণ যে, ঈদুল ফিত্বর ও আযহা তখনই, যখন সবাই মিলে পালন করা হবে। (তিরমিযীর উর্দু অনুবাদ ১/৩৬৬) বিস্তারিত জানতে দেখুন ঃ তাহযীবুস সুনান, ইবনুল ক্বাইয়েম, আউনুল মা'বূদ ৪/৪৪৩, সুবুলুস সালাম ৩/৭৩, ফাইযুল ক্বাদীর ৪/৩২০, সিঃ সহীহাহ আলবানী ১/৪৪৩-৪৪৪

(১১৪) ইবনে মাজার সিন্ধী টীকা ১০৫পৃঃ

এবং মিষ্টি বেশি ক'রে দাও।' আমি বললাম, 'আজ আমি শুধু এই আশঙ্কায় রোযা রাখিনি যে, আজ কুরবানীর দিন না হয়।' এ কথা শুনে তিনি বললেন,

النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ.

অর্থাৎ, কুরবানীর দিন সেদিন, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে এবং ঈদের দিন সেদিন, যেদিন লোকেরা ঈদ করে।[১১৫]

ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ)র নিকট এ কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর সুনানে আলোচ্য হাদীসের উপর শিরোনাম বেঁধেছেন,

باب إذا أخطأ القوم الهلال

বাব ঃ যখন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করে।[১১৬]

অর্থাৎ, এই বাব (পরিচ্ছেদ) এ কথা বয়ান করার জন্য যে, কোন সম্প্রদায় চাঁদ দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু ভুল হয়ে গেল। (আসলে চাঁদ আকাশে ছিল। কিন্তু মেঘ ইত্যাদির কারণে দেখা গেল না।) সুতরাং তারা মাসের গণনা ৩০ পূরণ ক'রে নিল। অতঃপর পরবর্তীতে জানা গেল যে, মাস ২৯শের ছিল। তাহলে এ ব্যাপারে বিধান কী?[১১৭]

ইমাম বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) ও নিজ সুনানে বাব বেঁধেছেন,

باب القوم يخطئون في رؤية الهلال

বাব ঃ লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করলে (তার বিধান)।

অতঃপর উক্ত বাবে হযরত আবূ হুরাইরা ও হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র হাদীস উল্লেখ করেছেন।[১১৮]

হাদীস-গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ইমাম আবূ সুলাইমান খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের একই অর্থ বিবৃত করেছেন।[১১৯]

(১১৫) বাইহাক্বী ৪/২৫২, ৮৪৬৮নং

(১১৬) আবূ দাউদ ২৩২৬নং হাদীসের শিরোনাম দ্রঃ

(১১৭) আউনুল মা'বূদ ৬/৩১৬

(১১৮) বাইহাক্বী ৪/২৫২, ৮৪৬৫-৮৪৬৮নং, আবূ হুরাইরা ﵁-এর হাদীস ঃ

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হাদীস ঃ النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

(১১৯) মাআলিমুস সুনান ৩/২১৩

এই বিশদ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য হাদীস দর্শন-অভিন্নতার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। বরং তাতে রয়েছে একটি ব্যাপক বিধান, যাকে উদয়স্থল-ভিন্নতার আলোচনায় উল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে।

৩। যুক্তি ও কিয়াস থেকে দলীল ঃ

দর্শন-অভিন্নতা (সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা-ঈদ করা)র সমর্থকরা একটি বিবেকপ্রসূত দলীল বা যুক্তি এই পেশ ক'রে থাকেন যে, দর্শন-অভিন্নতা মেনে নেওয়ার একটি লাভ এই হবে যে, সারা বিশ্বের মুসলিমরা যেমন জুমআর নামায একই দিনে আদায় ক'রে থাকে, তেমনই তাদের রোযা, ঈদ ও কুরবানীও একই দিনে পালন করতে সক্ষম হবে। আর তার ফলে তাদের আপোসের ঐক্য ও সংহতিতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে যদি মুসলিমদের দ্বীনী পালপার্বণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে পালন করা হয়ে থাকে, তাহলে তার ফলে তাদের ঐক্যই শুধু বিনষ্ট হবে তা নয়, বরং অন্য জাতির সামনে তাদেরকে হাস্যাস্পদ হতে হবে।[১২০]

এই যুক্তির উপর আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) বিশেষ মনোযোগ ব্যয় করেছেন। শাম দেশের প্রসিদ্ধ ফক্বীহ শায়খ অহবাহ যুহাইলী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ফিক্বহুল ইসলামী অআদিল্লাতুহ'তে এই দলীলের উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং একজন ভারতীয় আলেম এটিকে খুব উদ্দীপিত করেছেন।[১২১]

কিন্তু এই যুক্তিতে একটি বড় সমস্যা আছে। যদি দর্শন-অভিন্নতাকে মেনে নেওয়াও যায়, তাহলে সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য কেবল একই দিনে একই তারীখে ঈদ পালন করা শুধু মুশকিল কাজই নয়; বরং অসম্ভব বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, সঊদী আরবে অথবা তার আশেপাশের ইসলামী দেশগুলিতে চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্রীষ্মের দিন, এখানে এখন সূর্য ৭টার সময় অস্ত যায়। এই সময় সঊদিয়া থেকে পূর্বে অবস্থিত কিছু দেশ, যেমন ফিজি, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদিতে সকাল ৩.৩০-৪টা বাজবে। অর্থাৎ, সেখানকার লোকেরা ফজরের নামায পড়ে ফেলবে। কারণ দুই দেশের সময়ের

(১২০) দেখুন ঃ মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড, ১৯১-১৯২পৃঃ
(১২১) আওয়াইলুশ শুহূর, মক্কা মুকার্রামা কী রুয়াতে হিলাল ৮পৃঃ

মাঝে ৮-৯ ঘন্টার পার্থক্য। আর এ কথাও স্পষ্ট যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সঊদী আরবে চাঁদ দেখার ঘোষণা রাত্রি ৯-১০টা বাজার আগে খুব কমই হয়ে থাকে। কেননা, সাধারণ ঘোষণার পূর্বে চাঁদ দেখার ব্যাপারকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। সর্বপ্রথম স্থানীয় কাযী (জজ) তা তদন্ত করে দেখেন। অতঃপর ব্যাপারটি উচ্চ বিচার বিভাগীয় সভায় দর্শনের প্রমাণ-অপ্রমাণ নিয়ে তদন্তের পর শাহী দেওয়ানে রিপোর্ট করা হয়। অতঃপর সেখানে স্বীকৃতি পেয়ে পর্যায়ক্রমে বিচার-বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং প্রচার মাধ্যমের কাছে আসে। এইভাবে বড় চেষ্টার পরে চাঁদ দেখা ও তার ঘোষণার ব্যাপারে কম-সে-কম ২-৩ ঘন্টা লেগে যায়। ফলে সে সময় ফিজি ও নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারীদের চাশ্তের সময় হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল, সেখানকার লোকেরা ঐ দিনে কীভাবে নিজেদের ঈদ পালন করবে? অথবা রোযা কীভাবে শুরু করতে পারবে? আর যদি তারা সেদিন ঈদ পালন না করে এবং রোযা শুরু না করে, তাহলে একই দিনে ঈদ পালন করার যে সুর গাওয়া হচ্ছে, তা কীভাবে সম্পন্ন হবে? পরন্তু এই চাঁদ যদি সঊদী আরব থেকে আরো পশ্চিমে অবস্থিত কোন দেশে দেখা যায়, তাহলে উল্লিখিত সমস্যা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে।

এটা একটা উদাহরণ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহলে একদিনে রোযা-ঈদ করাতে আরো অনেক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যার সমাধান দর্শন-অভিন্নতার দাবীদারদের নিকট দেখা যায় না। বলা বাহুল্য মওলানা ইকবাল কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত সমস্যাকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এখানে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মওলানা (রাহিমাহুল্লাহ) এক জায়গায় লিখছেন, "এ বছর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের শওয়ালের চাঁদ লন্ডনে সন্ধ্যা ৪টা বেজে ৯ মিনিটে জন্ম নিল। তারীখ ছিল ২রা সেপ্টেম্বর। এই সময়ে পবিত্র হিজাযে (মক্কা-মদীনায়) সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৯ মিনিট, পাকিস্তানে রাত্রি ৯টা বেজে ৯ মিনিট, পূর্ব পাকিস্তানে রাত্রি ১০টা বেজে ৯ মিনিট, ফিজি উপদ্বীপ ও সাইবেরিয়াতে ভোর ৪টা বেজে ৯ মিনিট ছিল। তারীখ ছিল ২রা সেপ্টেম্বর। যেহেতু এ সকল জায়গা আন্তর্জাতিক গ্রিনিচ রেখার (জিরো ডিগ্রির) পূর্ব দিকে অবস্থিত।

হিজায-সরকার এই সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ, ২রা সেপ্টেম্বর ৭টা ৯ মিনিট রাতে আগামী কাল ঈদ হওয়ার কথা ঘোষণা করল। তাহলে ফিজি উপদ্বীপ ও সাইবেরিয়ার মুসলিমরা সেই সময় কী এখতিয়ার করবে? যদি ঐ দিন ২রা

সেপ্টেম্বর ঈদ করে, তাহলে ঐক্য সম্ভব নয়। যেহেতু হিজাযে ঈদ হবে ৩রা সেপ্টেম্বর। আর যদি রোযা রাখে, তাহলে কেন রাখবে? নতুন চাঁদ তো হয়ে গেছে। একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে রোযা শুরু করতে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও।

এ ছিল নতুন চাঁদ ও বিশেষ জন্মলগ্নের কথা। এখন আমরা দেখব, যদি নতুন চাঁদের (জন্মের) জায়গায় চাঁদ দেখাকেই বুনিয়াদ বানানো হয়, তাহলে সে ঐক্য ও সংহতি কি সম্ভব? এ কথা প্রথমেই স্পষ্ট হয়েছে যে, চাঁদের জন্ম ও চাঁদ দেখা দুটি পৃথক জিনিস। উভয়ের মাঝে ২৪ থেকে ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবধান হতে পারে। আর এ কথাও অনস্বীকার্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে চাঁদ দেখার জন্য সারা দুনিয়ার সকল স্থানে ২৪ ঘন্টার জায়গায় ২৪ ঘন্টা ৪৯ মিনিট সময় প্রয়োজন। তাহলে যদি সারা দুনিয়ার জন্য চাঁদ দেখার কথা ঘোষণা করা হয়, তাহলে উপরোক্ত উদাহরণের চাইতে বেশি সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন উপরোক্ত উদাহরণে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কা মুকার্রামায় চাঁদ দেখতে পাওয়া গেল এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আগামী দিন ঈদ হওয়ার কথা ঘোষণা ক'রে দেওয়া হল। তখন মেক্সিকো (আমেরিকা)তে বেলা সাড়ে নয়টা হবে। তাহলে সেখানকার লোকেরা কি ঐ দিন রোযা পুরো ক'রে পরের দিন ঈদ পালন করবে, নাকি (খবর পাওয়া মাত্র) সাথে সাথে ইফতার ক'রে সেই দিনেই ঈদ পালন করবে? উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থাটি মক্কা মুকার্রামার সাথে একতা বা সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে?

আমি বলছি, শরয়ী নির্দেশকে বিলকুল পৃষ্ঠপিছে নিক্ষেপ করা হলেও যে ঐক্য ও সংহতির আশা করা হচ্ছে, তা পূরণ হওয়া নজরে আসবে না। মনগড়া পদ্ধতিতে খ্রিস্টীয় পঞ্জিকায় সময়সমূহকে আগে-পিছে করার ফলে, গ্রিনিচ-রেখার উপর এক দিন কম-বেশি করার ফলে, অর্থাৎ একই দিনে দুই রকম জোড়াতালি দিয়ে খ্রিস্টীয় তারীখে যে সমতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে বাস্তব অবস্থায় কোন পার্থক্য পড়তে পারে না।

চাঁদ দেখার ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট তারীখে দুই দিনের পার্থক্য পড়তে পারে। তবে নেহাতই কম জায়গায়, অর্থাৎ দুনিয়ার সাতাশতম ভাগে। কিন্তু আমরা দেখি যে, দুই দিনের পার্থক্য অধিকাংশ সময়ে পরিদৃষ্ট হয়। যার কারণ ঐ মনগড়া পদ্ধতি। যাকে ভিত্তি ক'রে খ্রিস্টীয় পঞ্জিকায় এক দিনের পার্থক্যকে দূরীভূত করা হয়েছে, যা গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই পার্থক্যও চান্দ্র তারীখে গিয়ে পড়ে। যদি এ মনগড়া পদ্ধতি দূর ক'রে দেওয়া

হয়, তাহলে চান্দ্র তারীখের গড়মিল আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে। এখন এঁরা চাচ্ছেন যে, অনুরূপ মনগড়া পদ্ধতিতে চান্দ্র তারীখের গরমিল দূর করা হোক। আমাদের আবেদন এই যে, এ মনগড়া পদ্ধতি 'কাবীসাহ' বা 'নাসী'র পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রাখে, চান্দ্র পঞ্জিকায় যার কোন জায়গা নেই এবং যা মুসলিমদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মেঘ-বৃষ্টি অথবা অন্য কারণে আকাশ অপরিষ্কার থাকার কারণে চাঁদ নজরে না এলে তাতে পঞ্জিকায় কোন প্রভাব পড়ে না। এ গরমিল কেবল স্থানীয়ভাবে হয়ে থাকে এবং এমন গরমিল হিলাল-কমিটি অথবা স্থানীয় প্রশাসন সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে ঘোষণার মাধ্যমে দূর করতে পারে। তবে তাতে শর্ত হল, উদয়স্থল অভিন্ন হবে, ভিন্ন হবে না। উদয়স্থলের ভিন্নতার কথা আমরা পূর্বের পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বিবৃত করেছি। চান্দ্র তারীখে গরমিল বা মতভেদের এটা এমন একটি প্রকার, যা আমরা সৌজন্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে দূর করতে পারি।

ঘোষণার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় চান্দ্র তারীখ অভিন্ন করার মাসআলাটি বড় টেরা এবং কোন নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট ক্ষণে ঈদ ইত্যাদি পালনে ঐক্য তার থেকেও বেশি মুশকিল। আমরা যদি চাই যে, হজ্জের দিন সম্মানিত হাজীগণের দুআর সময় আমরাও তাঁদের সাথে শরীক হয়ে ইবাদত পালন করব, তাহলে তা হবে কঠিন কাজ। কারণ ৯ম যুলহজ্জের সূর্য ঢলার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্মানিত হাজীগণ আরাফাত ময়দানে দুআ ক'রে থাকেন। এটাই হল হজ্জের সবচেয়ে বড় রুক্ন এবং মূল হজ্জ। সূর্য ডোবার পর তাঁদেরকে প্রস্থান ক'রে 'মাশআরুল হারাম' (মুযদালিফায়) যেতে হয়। সেই সময় ভারত ও চীনের মুসলিমরা গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে। অস্ট্রেলিয়াতে সেহরীর সময় হয়। সময়ের সেই মিল সৃষ্টি করার জন্য কি মুসলিমদেরকে বাধ্য করা হবে?

একই অবস্থা কুরবানীর দিনের। ১০ম যুলহজ্জে হাজীগণ দিন শুরু হতেই মুযদালিফা থেকে মিনা আসেন। সেখানে এসে পাথর মারেন। তারপর কুরবানীর সময় হয়। সুতরাং সূর্য উদয়ের প্রায় ৩ ঘন্টা পর কুরবানীর সময় আসে। আর আমরা তখন কুরবানীর গোশ্ত পাকিয়ে খেয়ে হজমও ক'রে ফেলি। তাহলে এ কাজ হাজীদের সাথে সাথে হয়, নাকি আগে আগে? পরন্তু এমন এলাকাও আছে, যেখানকার মুসলমান কুরবানীর এই দিন পার করে

শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এ দিকের পরিস্থিতি এই যে, সম্মানিত হাজীগণ তখনও মুযদালিফা থেকে প্রস্থানও করেননি। এরই উপর অনুমান ক'রে আমাদের নামাযের অবস্থাও তাই, তাতে সময়ের ঐক্য সম্ভবই নয়। হিজাযবাসীরা যখন যোহরের নামায আদায় করে, তখন আমরা আসরের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। তারা যখন ফজর পড়ে, তখন এখানে সূর্য বেশ উঁচুতে উঠে যায়।"

মক্কা মুকার্‌রামার চাঁদ দর্শনের গণ্যতা

এ কথা উল্লিখিত হয়েছে যে, এই অভিমতের আবিষ্কর্তা হলেন আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর সহমত পোষণ করেননি। আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) একটি আয়াত ও একটি হাদীসকে ভিত্তি ক'রে দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١٨٩) سورة البقرة

"লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে) বল, উহা লোকেদের (কাজ-কারবারের) এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৯)

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ লোকেদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাঁদের তিথিসমূহের গরমিল ও তার মাঝে কম-বেশিতে তাদের সকল কাজ-কারবার ও সময়ের বিবরণ রয়েছে। বিশেষ ক'রে হজ্জের দিনসমূহ নির্ধারণ। সুতরাং আমার বুঝ মতে আম সময়ের কথা বলে খাস হজ্জের সময়ের কথা বলার মাঝে এ কথার দিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, লোকেদের উচিত, নিজেদের সময়ের নির্ধারণও একই জায়গা অর্থাৎ, হজ্জের জায়গা মক্কা মুকার্‌রামা অনুযায়ী করুক।" [১২২]

([১২২]) আওয়াইলুশ শুহূর ৩১পৃঃ

কিন্তু এই দলীল গ্রহণে একাধিক দিক দিয়ে আপত্তি রয়েছে ঃ-

এক ঃ আয়াতের উক্ত তফসীর উম্মতের পূর্বাপর সকল উলামার তফসীর থেকে ভিন্ন। [১২৩]

দুই ঃ এই দাবী যে, 'আয়াতের ভিতরে হজ্জের উল্লেখ কালনির্ধারণকে স্থাননির্ধারণের সাথে যোগসূত্র কায়েমের জন্য এসেছে।' এটা একটা সূক্ষ্ম রহস্য। যা স্পষ্টীকরণের জন্য কোন স্পষ্ট দলীল দরকার। চাহে তা নবী ﷺ-এর বয়ান থেকে হোক অথবা তাঁর আমল থেকে হোক। অথচ উভয়ই অবিদ্যমান। এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের কোন আলেম কালনির্ধারণকে স্থাননির্ধারণের সাথে নিবদ্ধ করেননি। [১২৪]

হাদীস থেকে দলীল ঃ

নবী ﷺ বলেছেন,

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)).

অর্থাৎ, রোযা, যেদিন তোমরা রোযা রাখো। ইফতার, যেদিন তোমরা ইফতার কর এবং কুরবানী, যেদিন তোমরা কুরবানী কর। [১২৫] [১২৬]

([১২৩]) উক্ত আয়াতের তফসীরে তফসীরকার উলামাগণের সারসংক্ষেপ কথা এই যে, যেহেতু হজ্জ ইসলামের একটি রুক্‌ন, যার জন্য সময়ের পরিচিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যেহেতু মুশরিকরা 'নাসী' ও 'কাবীসা'র বিদআত আবিষ্কার ক'রে হজ্জের মাস ও দিনে পরিবর্তন সাধন করেছিল, সেহেতু তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারে 'নাসী' ও 'কাবীসা'র বিদআত জায়েয নয়। বরং তার জন্য যুলহজ্জের মাস স্বাভাবিক নিয়মে নির্ণয় করা হোক। (দেখুন ঃ তফসীর কুরতুবী ২/৩৪৩, তফসীর শাওকানী ১/২৪০)

([১২৪]) মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৫৪

([১২৫]) আবূ দাউদ ২৩২৬, তিরমিযী ৬৯৭নং এবং শব্দাবলী তাঁরই, ইবনে মাজাহ ১৬৬০নং

([১২৬]) হাদীসের যে অনুবাদ উল্লিখিত হয়েছে, তার অর্থ স্পষ্ট, তাতে কোন প্রকার জটিলতা নেই। (ইতিপূর্বে যার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) কিন্তু যে অনুবাদ আমাদের এক হযরত করেছেন, তাও উল্লেখ করা হচ্ছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এ অনুবাদও লক্ষ্য করুন ও দেখুন যে, এটা হাদীসের অনুবাদ নাকি অপব্যাখ্যা ও অর্থবিকৃতি? মুহতারাম লিখেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কাবাসীকে সম্বোধন ক'রে) বলেছেন, রোযা (সারা মুসলিম-বিশ্বে সেখানে চাঁদ দেখার খবর অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে শা'বানের ৩০ দিন পূরণ হয়ে যাওয়ার খবর পানাহারাদি থেকে বিরত হওয়া ওয়াজেব হওয়ার পূর্বে পৌঁছে---

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করার পর নিজ পুস্তিকার প্রায় তিন পৃষ্ঠা জুড়ে তার 'ইল্মী তাখরীজ' করেছেন। (হাদীসটির বর্ণনাসূত্র ও রেফারেন্স্ নিয়ে আলোচনা করেছেন।) যাতে তিনি এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্ত বিবৃতি বিদায়ী হজ্জের সময়ে ছিল। সুতরাং তিনি লিখেছেন, "এ সকল হাদীসে রোযা, কুরবানী, ইফতার (ঈদ) ইত্যাদির উল্লেখ বিদায়ী হজ্জের সময়ে করাতে এ কথা বুঝতে পারা যায় যে, সারা মুসলিম-জাহানে রোযা সেই দিন রাখা হবে, যেদিন মক্কাবাসী রোযা রাখবে। ইফতার (ঈদ) সেদিন করা হবে, যেদিন মক্কাবাসী ইফতার (ঈদ) করবে। আরাফাতের ময়দানে সেদিন অবস্থান করা হবে, যেদিন মক্কাবাসী সেখানে অবস্থান করবে। বলা বাহুল্য, এই স্থানসমূহকে চাঁদ দেখা প্রমাণের জন্য নির্ভরযোগ্য মানতে হবে এবং মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হবে এখানকার উদয়স্থলকে মান্য করা।" (১২৭)

এই শর্তে) সেই দিন বিধেয় হবে, যেদিন তোমরা (হে মক্কাবাসী) রোযা রাখতে শুরু করবে। আর (অনুরূপ সারা মুসলিম-বিশ্বে) রোযার ধারাবাহিকতা শেষ করা হবে, যেদিন তোমরা (হে মক্কাবাসী) রোযার ধারাবাহিকতা শেষ করবে। (অনুরূপ মুসলিম-বিশ্বে) কুরবানী সেদিন হবে, যেদিন (১০ম থেকে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত) তোমরা কুরবানী করবে।" (মক্কা মুকার্রামা কী রুয়াতে হিলাল ৯-১০পৃঃ)

আমি যেটা বুঝি, সেটা হল, এটা হাদীস শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নয়, বরং অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(১২৭) আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র তাখরীজ ও সমীক্ষার উপর একাধিক আপত্তি আছে। যা পেশ করা আমার মতো তালেবে ইলমের জন্য শোভনীয় নয়। অবশ্য সত্যানুসন্ধানী শিক্ষানুরাগীদের নিকট আবেদন এই যে, হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র একাকিত্বকে খেয়ালে রাখবেন। এ ব্যাপারে আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র প্রচেষ্টা বেশি সফল প্রমাণিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য হাদীসের তাখরীজে এক জায়গায় লিখছেন, 'যারা ওয়াকেদীকে যয়ীফ বলে, তাদের বিপরীত তিনি আমাদের নিকট সিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য)।' (টীকা ২২পৃঃ) অথচ ইলমুল জারহি অত-তা'দীলে (হাদীসের বর্ণনাকারীদের সবল-দুর্বল নির্ধারণ-বিদ্যায়) একটি অনস্বীকার্য ব্যাপার যে, ওয়াকেদী শুধু দুর্বলই নয়; বরং কঠিন দুর্বল। এমনকি ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে পরিত্যাজ্য বলেছেন এবং ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি হাদীস জাল করতেন। পূর্ববর্তী উলামাগণের উক্তিসমূহের সারসংক্ষেপ হাফেয যাহাবী এক বাক্যে পেশ করেছেন, 'তাঁর পরিত্যাজ্য হওয়া সর্বসম্মত।' হাফেয ইবনে হাজার লিখছেন, 'অগাধ ইল্ম থাকা

কিন্তু (রাহিমাহুল্লাহ)র এই দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় আপত্তি আছে ঃ-

প্রথমতঃ 'এ সম্বোধন মক্কাবাসী বা হাজীগণের উদ্দেশ্যে ছিল'---আল্লামার এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তিনি যে সনদের ভিত্তিতে উক্ত হাদীসকে হজ্জ ও তার মৌসুমের সাথে সম্পৃক্ত মনে করেছেন, তা শুদ্ধ নয়। আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র দলীল হল সুনানে আবূ দাঊদে উল্লিখিত হাম্মাদ বিন যায়দ, তিনি আইয়ুব হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে বর্ণনাসূত্রের নিম্নের হাদীস। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ ».

"তোমাদের ঈদের দিন সেটা, যেদিন তোমরা ঈদ পালন কর। কুরবানীর দিন সেটা, যেদিন তোমরা কুরবানী কর। পুরো আরাফাতই অবস্থানের জায়গা। পুরো মিনাই কুরবানীর জায়গা। মক্কার সমস্ত গলিই কুরবানীর জায়গা। এবং পুরো মুযদালিফাই অবস্থানের জায়গা।" (১২৮)

উক্ত হাদীসের তাখরীজে আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

فالسند صحيح لولا أنه منقطع فان ابن المنكدر لم يسمع من أبى هريرة كما قال البزار وغيره...

অর্থাৎ, হাদীসের সনদ সহীহ; যদি বিচ্ছিন্ন না হতো। যেহেতু ইবনুল মুনকাদির আবূ হুরাইরা হতে শুনেননি; যেমন বায্যার প্রভৃতি ইমামগণ বলেছেন। (১২৯)

জানা গেল যে, আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) যে সনদকে ভিত্তি ক'রে উক্ত

সত্ত্বেও তিনি পরিত্যাজ্য।' অর্থাৎ, আল্লামা হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরিত্যাজ্য। (দেখুন ঃ আল-মুগনী ২/৬১৯, আত-তাক্বরীব ৮৮২পৃঃ)

(১২৮) আবূ দাঊদ ২৩২৬, দারাক্বুত্বনী ১/১৬৩, বাইহাক্বী ৪/২৫১

(১২৯) ইরওয়াউল গালীল ৪/১১, প্রকাশ থাকে যে, আমি হাদীসকে 'যয়ীফ' বলিনি, বরং সনদকে 'যয়ীফ' বলেছি। হাদীসের মূল বক্তব্য সহীহ। যেহেতু এ হাদীসের পুরো বাক্য পৃথক পৃথকভাবে সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত। দেখুন ঃ আল্লামা আলবানীর ইরওয়াউল গালীল ৪/১১, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৪নং, আমার বলার আসল উদ্দেশ্য হল, আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসের যে সনদ ও শব্দগুচ্ছকে দলীল গ্রহণের ভিত্তি করেছেন, তা সহীহ নয়।

ঘটনাকে বিদায়ী হজ্জের সাথে জুড়তে চেয়েছেন, তা সহীহ নয়। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা প্রমাণ না হয় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উক্ত বাণী বিদায়ী হজ্জের সময় ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বর্ণনার উপর দলীল গ্রহণের বুনিয়াদ রাখা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ যদিও এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, নবী ﷺ-এর উক্ত উক্তি হজ্জের সময় ছিল, তাহলে কোন্ দলীলের ভিত্তিতে এ কথা বলা হয় যে, এ সম্বোধন কেবল মক্কাবাসীর জন্য ছিল এবং সারা উম্মতের জন্য ছিল না? (অথচ সেখানে মক্কাবাসী ছাড়া অন্য এলাকারও লোকজন উপস্থিত ছিল।) সুতরাং এটা দলীলহীন একটা দাবী। যদি আয়াত ও হাদীসের তফসীর ও ব্যাখ্যার এই দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তো যে কেউ নিজের ইচ্ছামতো তফসীর ও ব্যাখ্যা ক'রে বেড়াবে। অথচ তা হল শিয়া ও অন্যান্য ভ্রষ্ট ফির্কার নীতি।

তৃতীয়তঃ যদি এ সম্বোধন বিশেষ ক'রে মক্কাবাসীর জন্য ছিল, তাহলে তাতে অভিন্ন দর্শন ও সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা-ঈদ করার প্রমাণ কোথায় রয়েছে? বরং হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এই সমাবেশকে সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার ক'রে আমভাবে সারা উম্মতকে সম্বোধন করলেন যে, প্রত্যেক জায়গায় মুসলিমদের উচিত, নিজেদের রোযা, ঈদ ও কুরবানীর সময়ে যেন আপোসে মতভেদ না করে; যেমন আজকাল দেখা যাচ্ছে। বরং যেখানেই চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে, সেখানকার লোকেরা কোন মতভেদ ও মতবিরোধ ছাড়া এক সাথে রোযা, ঈদ ও কুরবানী পালন করবে।

চতুর্থতঃ মক্কা মুকার্রামা (শার্রাফাহাল্লাহ)কে চাঁদ দেখার কেন্দ্র বানিয়ে নেওয়াতে একটা খুব বড় সমস্যা দেখা দেবে। যে সকল দেশ মক্কা মুকার্রামার পশ্চিমে অবস্থিত এবং দ্রাঘিমারেখাতে পার্থক্যের ফলে সেখানে চাঁদ আগে দেখা যায়। তাহলে তারা চাঁদ দেখে নেওয়া সত্ত্বেও নিজেদের দর্শনকে প্রামাণ্য গণ্য করবে না। অর্থাৎ, যদি রমযানের চাঁদ হয়, তাহলে চাঁদ দেখা সত্ত্বেও রোযা রাখা শুরু করবে না; যদিও শরয়ীভাবে মুবারক রমযানের মাস তারা প্রাপ্ত হয়েছে। আর যদি ঈদের চাঁদ হয়, তাহলে চাঁদ দেখা সত্ত্বেও ঈদ পালন করবে না। কেননা, মক্কা মুকার্রামায় এখনো চাঁদ দেখা যায়নি। অথচ তাদের কাছে শওয়াল মাস প্রবেশ করেছে। আর এইভাবে তারা দুটি সমস্যার সম্মুখীন হবে।

(দুটি বিরোধিতার শিকার হবে।)

এক ঃ রমযানের চাঁদ দেখা সত্ত্বেও তারা রোযা রাখবে না।

দুই ঃ ঈদের চাঁদ দেখা সত্ত্বেও তারা ঈদ করবে না।

এই শ্রেণীর সমস্যা (বা বিরোধিতা)র সম্মুখীন মক্কা মুকার্রামার পূর্বে অবস্থিত দেশবাসীরাও হতে পারে। (যেহেতু তারা চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও রোযা-ঈদ করবে।) অথবা এ কথা বলতে হবে যে, মক্কা মুকার্রামা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানরা ছাড়া অন্যদেরকে "চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ কর"---এ হাদীস দ্বারা সম্বোধন করা হয়নি। অথবা যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদের উপর নজর পড়ে যায়, তাহলে সত্বর নজর ফিরিয়ে নেবে, যাতে রমযান মাসে রোযা ছাড়া এবং ঈদের দিনে রোযা রাখার গোনাহতে লিপ্ত না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ এটা (উক্ত হাদীসের) এমন এক অর্থ, যার ব্যাপারে নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বছর, বরং তারও বেশি সময় পর্যন্ত করুণাপ্রাপ্ত উম্মত অজ্ঞ ছিল। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না কোন মুফাস্‌সির বুঝলেন, আর না কোন মুহাদ্দিস, আর না-ই কোন ফক্বীহ!

এখন প্রশ্ন হল, এমন হওয়াটা কি সম্ভব?

حاشا لله سبحانك هذا بهتان عظيم.

এ হাদীসের সঠিক অর্থ কী? পিছনের পঙক্তিগুলিতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দর্শন-ভিন্নতার দলীলসমূহ

যাঁরা বলেন, এলাকাভিত্তিক চাঁদ দেখে রোযা-ঈদ করতে হবে, তাঁদের মতের সপক্ষে বর্ণিত দলীল ও যুক্তি রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ-

বর্ণিত (হাদীস থেকে) দলীল

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত কুরাইব বিন আবী মুসলিম, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস বলেন, একদা উম্মুল ফায্ল বিন্তুল হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)[১৩০] আমাকে শাম দেশে মুআবিয়া ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর

(১৩০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর আম্মা।

আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?' আমি বললাম, 'আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং হযরত মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।' হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, 'কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।' আমি বললাম, 'মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।'[১৩১]

উক্ত হাদীস দর্শন-অভিন্নতার বিপক্ষে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল। কেননা, উম্মতের সুপন্ডিত রসূল ﷺ-এর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ শামদেশের দর্শনকে হিজাযের জন্য গণ্য বলে মনে করলেন না। বরং এ কথা বলে রদ্দ ক'রে দিলেন যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।' তার মানে এক জায়গার দর্শন অন্য জায়গার জন্য যথেষ্ট নয়।

কিন্তু উক্ত দলীলের উপর একাধিক আপত্তি জানানো হয়েছে ঃ-

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-এর উক্তি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।'---এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন্ আদেশ উদ্দিষ্ট?

ভাববার বিষয় যে, এ ব্যাপারে কি তাঁর কাছে বিশেষ কোন আদেশ ছিল? অথবা তাঁর উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই আদেশ,

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا)).

"তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো। অতঃপর

(১৩১) মুসলিম ২৫৮০, আহমাদ ১০/৩০৬, আবূ দাউদ ২৩৩৪, তিরমিযী ৬৯৩নং, নাসাঈ ৪/১৩১

তোমাদের মাঝে ও চাঁদের মাঝে মেঘ অন্তরাল হলে ৩০ সংখ্যা পূরণ ক'রে নাও এবং আগে বেড়ে মাসকে বরণ করো না।"[১৩২]

যদি ইবনে আব্বাস ﵄-এর নিকট কোন নববী আদেশ ছিল, তাহলে তা জানা দরকার, যাতে দেখা যায় যে, তা নিজ অর্থে কতটা স্পষ্ট। আর 'আদেশ' বলতে যদি উল্লিখিত বাণী (তাঁর বর্ণিত হাদীস) হয়, তাহলে তা একটা ব্যাপক আদেশ। যা দিয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়, দেশ বা এলাকার লোককে সম্বোধন করা হয়নি। সুতরাং এটা বিরোধীদের দলীল হতে পারে না (যারা বলে, এক এলাকার দেখা চাঁদ অন্য এলাকার রোযা-ঈদের জন্য যথেষ্ট নয়)। পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-এর শামদেশের দর্শন গ্রহণ বা মান্য না করার ব্যাপার, সেটা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ, যা মানতে আমরা বাধ্য নই।[১৩৩]

উক্ত আপত্তির জবাব এই যে, পূর্বাপর বাগ্ধারা থেকে এ কথা প্রকাশ পায় যে, ইবনে আব্বাস ﵄-এর নিকট কোন স্পষ্ট আদেশ বা নির্দেশ ছিল। অথবা তিনি (স্ববর্ণিত হাদীসে) উক্ত নবী ﷺ-এর আদেশ থেকে এ কথা বুঝেছেন যে, প্রত্যেক এলাকার লোকদিগকে ঐ নববী আদেশ দ্বারা তেমনি সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন নামাযের সময় দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তারা যোহরের নামায তখন পড়বে, যখন তাদের আকাশে সূর্য ঢলে যাবে। অনুরূপ রোযা তখন শুরু করবে, যখন রমযান মাস উপস্থিত হবে।

শায়খুল হাদীস উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

وعندي كلام الشوكاني مبني على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث. والشام في جهة الشمالية من المدينة مائلاً إلى المشرق وبينهما قريب من سبعمائة ميل ، فالظاهر إن ابن عباس رضي الله عنه إنما لم يعتمد على رؤية أهل الشام ، واعتبر اختلاف المطالع لأجل هذا البعد الشاسع.

(১৩২) আহমাদ ১৯৮৫, আবূ দাউদ ২৩২৯, তিরমিযী ৬৮৮, নাসাঈ ২১২৯, ইবনে খুযাইমা ১৯১২, ইবনে হিব্বান ৩৫৯০, দারেমী ১৬৮৩, হাকেম ১৫৪৭, বাইহাক্বী ৮২০১নং, ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত।

(১৩৩) এ হল ইমাম শওকানীর আপত্তির সারসংক্ষেপ। দেখুন নাইলুল আওত্বার ২/৫০৬-৫০৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩০৮-৩০৯

"আমার নিকট শওকানীর কথা কষ্টকল্পনার উপর ভিত্তিশীল, হাদীসের প্রকাশ্য বাগ্‌ধারা যার খন্ডন করছে। শামদেশ মদীনার উত্তর-পূর্বে ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তাই যা স্পষ্ট হয়, তা এই যে, ইবনে আব্বাস ﷺ শামদেশের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করেননি এবং এই বিশাল ব্যবধানের কারণে উদয়স্থল-ভিন্নতাকে মান্যতা দিয়েছেন।[১৩৪]

এ ছাড়া এ কথা সদা-সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ নবী করীম ﷺ-এর কথা সরাসরি শুনতেন এবং তাঁর বক্তব্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য বেশি বুঝতেন। বিশেষ ক'রে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর মত একজন ফক্বীহ সাহাবী, যাঁর ব্যাপারে নবী ﷺ-এর খাস দুআ ছিল,

((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ)).

"হে আল্লাহ! তুমি ওকে দ্বীনের ফিক্বহ (জ্ঞান) দান কর এবং তফসীরের ইল্‌ম শিখিয়ে দাও।"[১৩৫]

আরো বিশেষ ক'রে সেই সময় মদীনা মুনাওয়ারায় বহু সাহাবা ﷺ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু কেউই হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর কথার প্রতিবাদ করেননি।[১৩৬]

এই জন্য কোন স্পষ্ট দলীল ছাড়া সিংহভাগ সাহাবার বুঝকে রদ্দ করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়। এ ছাড়া সেই সকল মুহাদ্দিসীন, যাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর উক্ত হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন, তাঁরাও তাঁর ফিক্বহ ও সমঝের সমর্থন করেছেন। যেমন তাঁদের উক্তি আগামী পঙ্‌ক্তিসমূহে উল্লেখ করা হবে।

(২) উক্ত দলীলের উপর দ্বিতীয় একটি আপত্তি এই করা হয় যে, সম্ভবতঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ শামদেশের চাঁদ দেখাকে এই জন্য মান্যতা দেননি যে, সেটা ছিল 'খবরে ওয়াহিদ' (এক ব্যক্তির সংবাদ) এবং 'খবরে

(১৩৪) মিরআতুল মাফাতীহ ৪/৪২৮, বাস্তব এই যে, দিমাস্ক ৩৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় এবং মদীনা মুনাওয়ারা ৪০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। আর উভয়ের মাঝে ৫ ডিগ্রির পার্থক্য আছে। যাতে উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার অবকাশ আছে।

(১৩৫) আহমাদ ২৩৯৭নং, এ হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ বুখারী ইত্যাদিতে বিদ্যমান আছে।

(১৩৬) মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৩৬

ওয়াহিদ'-এর সাক্ষ্য তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না।

কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, হতে পারে সেই সময় মদীনা মুনাওয়ারায় উদয়স্থল পরিষ্কার ছিল এবং মদীনাবাসী যখন চাঁদ দেখেনি, তখন সেই অবস্থায় চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

উক্ত আপত্তির জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমতঃ এটা নিছক একটা এমন দাবী, যার কোন দলীল নেই। যেহেতু হাদীসে তার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই।[১৩৭]

দ্বিতীয়তঃ কুরাইব চাঁদ দেখাতে একা ছিলেন না। বরং তাঁর সাথে মুসলিমদের একটি বড় দল চাঁদ দেখেছিল। মুসলিমদের খলীফা এবং শামদেশের সমস্ত মুসলমান সে দর্শনকে প্রামাণ্য মেনেছিল। যেমন সে কথা হাদীসের শব্দাবলীতেই সুস্পষ্ট।

তৃতীয়তঃ হযরত কুরাইব চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেননি, বরং তিনি এক বিশেষ জায়গায় চাঁদ হওয়ার খবর দিয়েছেন। আর উলামাগণের নিকট সাক্ষ্য দেওয়া এবং খবর দেওয়া---দুটি পৃথক জিনিস। উলামাগণ 'খবরে ওয়াহিদ' তো গ্রহণ করেন, অবশ্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ব্যাপারটা বিবেচনাসাপেক্ষ্য।[১৩৮]

(১৩৭) কোন কোন আলেম এর জবাবে বলেছেন যে, এ কথা কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হযরত কুরাইবের খবরকে শুধু এই জন্য উপেক্ষা করলেন যে, খবরদাতা কেবল একজন ছিল। যেহেতু তাঁরই বর্ণনায় আছে যে, এক বেদুঈন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি রমযানের চাঁদ দেখেছি।' তিনি বললেন, "তুমি কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দাও?" অর্থাৎ, তুমি কি মুসলিম? সে উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দাও?" সে উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ।' তা শুনে তিনি বললেন, "হে বিলাল! লোকদের মাঝে ঘোষণা ক'রে দাও যেন, আগামী কাল রোযা রাখে।" (আবূ দাউদ ২৩৬, তিরমিযী ৬৯১, নাসাঈ ২১১৪, ইবনে মাজাহ ৬৫২নং) এ হাদীস সহীহ কি না, তা নিয়ে উলামাদের মতভেদ আছে। (দেখুন ঃ আল-মাজমূ, নাওয়াবী ৪/২৮২, আল-মিরআত ৬/৪৪৮-৪৪৯, ইরওয়াউল গালীল ৪/১৫-১৬)

(১৩৮) ইমাম আবূ বাকর ইবনুল আরাবী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আহকামুল কুরআন'-এ লিখেছেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।' হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর এই উক্তির ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু হযরত কুরাইবের খবর 'খবরে ওয়াহিদ' ছিল, সেহেতু তিনি তা রদ্দ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু উদয়স্থলের দিক থেকে দুটি এলাকা ভিন্ন ভিন্ন ছিল, সেহেতু

চতুর্থতঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ যখন কুরাইবের খবর শুনলেন এবং শামদেশের চাঁদ দেখাকে প্রামাণ্য গণ্য করলেন না, তখন তিনি এ কথা বললেন না যে, 'তুমি খবরদানে একলা' অথবা 'সেদিন আমাদের আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লোকেরা চাঁদ দেখতে পায়নি' ইত্যাদি, বরং তিনি এই বলে সে খবর উপেক্ষা করলেন যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এই আদেশই দিয়েছেন।' অর্থাৎ, দূর দেশের চাঁদ দেখার উপর আমরা নির্ভর না করি।[১৩৯]

যুক্তির দলীল ঃ

যে উলামাগণ সারা বিশ্বে দর্শন-অভিন্নতার সমর্থক নন, তাঁরা এক যুক্তি পেশ করে বলেন যে, যদি দর্শন-ভিন্নতা জরুরী হত, তাহলে সাহাবাগণের যুগ থেকে পরবর্তী যুগের মুসলমান শাসক ও উলামাগণ নিজেদের রাজধানী কিংবা অন্য স্থানে চাঁদ দেখার কথা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর দেশের সকল প্রান্তে জানিয়ে দিতেন এবং যথাসম্ভব জনগণকে রোযা ও ঈদের ব্যাপারে একতাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন। অথচ এমন কোন দলীল বা ঘটনা পাওয়া যায় না। আজ এ অবধি চৌদ্দটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোন শতাব্দীর ব্যাপারে এ

তিনি ঐ খবর উপেক্ষা করেছিলেন। আর এ কথাই ঠিক। কেননা, কুরাইব (চাঁদ দেখার) সাক্ষ্য দেননি। (তাই একলা হওয়ার কারণে তা রদ্দ করা হয়েছিল।) বরং তিনি এমন এক সিদ্ধান্তের খবর দিয়েছিলেন, যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত ছিল। পরন্তু এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, যদি কোন খবর সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহিদ' যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ যদি (মরক্কোর) আগমাত শহরে বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখা যায় এবং (উন্দুলুসের) আশবিলিয়া শহরে (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাতে চাঁদ হয়, তাহলে প্রত্যেক শহরের নিজ নিজ দর্শন অনুযায়ী আমল হবে। কেননা, Canopus (অগস্ত্য নক্ষত্র) (অধিকাংশ সময়ে) আগমাতে নজর আসে, কিন্তু আশবিলিয়াতে নজর আসে না। এ হল উদয়স্থল-ভিন্নতার প্রমাণ। (তফসীর কুরতুবী ২/২৯৬)

ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) আলোচ্য (কুরাইবের) হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কুরাইবের খবরকে এই জন্য উপেক্ষা করলেন, যেহেতু চাঁদ দেখার কার্যকারিতা দূর দেশের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য গণ্য হবে না। (শারহু মুসলিম ৭/৮৪-৮৫, আরো দেখুন ঃ আল-মিরআত ৬/৪২৮, ফাতাওয়া আহলিল হাদীস ২/৩১০-৩১১)

([১৩৯]) মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৪৪-৪৫

খবর পাওয়া যায় না যে, সারা উম্মতকে অভিন্ন দর্শনের ভারপ্রাপ্ত করা হয়েছে। (একই দিনে রোযা-ঈদ পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।) নবী আকরাম ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এমন কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি যে, যেদিন মদীনাবাসী রোযা রাখতে শুরু করেছে অথবা যেদিন হিজাযবাসী ঈদ পালন করেছে অথবা যেদিন মক্কা-মদীনার লোক কুরবানী করেছে, সেদিন মুসলিমদের অন্যান্য এলাকা বা শহরসমূহের লোকেরাও ঈদ ও কুরবানী পালনে যত্নবান হয়েছে।[১৪০]

যদি বলা হয় যে, সে যুগে চাঁদের খবর দেওয়া মুশকিল কাজ ছিল, তাই নীরবতা এখতিয়ার করা হয়েছে, তাহলে স্পষ্ট মতলব এই যে, অভিন্ন-দর্শনের সেই গুরুত্ব নেই, যে গুরুত্ব বর্তমানে আরোপ করা হচ্ছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

অভিন্ন-দর্শনের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ও তার দলীল

প্রথম মত ঃ

উদয়স্থল অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন-দর্শন মান্য এবং উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন-দর্শন মান্য নয়।

এই মতাবলম্বী উলামাগণ দলীল স্বরূপ কুরআন, হাদীস ও যুক্তি পেশ ক'রে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এই মতাবলম্বী উলামাগণের দলীলসমূহ ঠিক সেইগুলি, যেগুলি অভিন্ন-দর্শনের সমর্থকগণ পেশ ক'রে থাকেন। অবশ্য দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ভিন্ন।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٨٥) سورة البقرة

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ বর্কতময় আয়াতে রোযা ওয়াজেব হওয়াকে মাসপ্রাপ্তির সাথে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। আর রোযার মাসের বিদ্যমানতা ২৯শে শা'বানের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা অথবা ত্রিশের গুনতি পুরা করার উপর নির্ভরশীল।

([১৪০]) দেখুন ঃ আল-আলামুল মানশূর ২৯পৃঃ, আবহাযু কিবারিল উলামা ৩/৩৩-৩৪

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, “চাঁদ দেখে রোযা করো, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো।” এখন এক ব্যক্তি এমন জায়গায় বসবাস করে, যেখানে উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার কারণে না শা’বানের ২৯ তারীখ আছে, আর না-ই চাঁদ দেখার সম্ভাবনা আছে। এইভাবে সেখানকার বাসিন্দাদের রমযান মাসপ্রাপ্তি হয় না। আর যখন রোযার মাসপ্রাপ্তি না হয়, তখন তাদের উপর রোযা কীভাবে ফরয হতে পারে? [১৪১]

উক্ত দলীলের উপর আপত্তি করা হয় যে, মহান আল্লাহ রমযানের রোযা সকল মুসলমানের উপর ফরয করেছেন। সুতরাং যখন নির্ভরযোগ্য লোক দ্বারা এ কথা প্রমাণ হল যে, পবিত্র রমযান শুরু হয়ে গেছে, তখন সকল মুসলমানের উপর ঐ দিনের রোযা রাখা ফরয হয়ে গেল। যেহেতু শরীয়ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক শহরবাসীর প্রতি চাঁদ দেখার শর্তারোপ করেনি। [১৪২]

এ আপত্তির জবাব এই দেওয়া হয় যে, যে জায়গার উদয়স্থল চাঁদ দেখা যাওয়ার জায়গার উদয়স্থল থেকে ভিন্ন, সেখানে রমযান মাস না শরীয়তগতভাবে প্রমাণিত, আর না যুক্তিগতভাবে। এই জন্য তাদের উপর ঐ নির্দেশ কার্যকর হবে না।

হাদীস থেকে দলীল

(১) মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)).

“মাস ২৯ রাতের হয়। অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না। অতঃপর আকাশ মেঘলা থাকলে গুনতি ৩০ পূর্ণ ক’রে নাও।” [১৪৩]

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ উক্ত হাদীস এবং তারই অনুরূপ অন্যান্য হাদীস (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) তাতে আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমতঃ রোযা ও ঈদকে চাঁদ দেখার শর্তাধীন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ চাঁদ দেখার প্রমাণ না পাওয়া গেলে ৩০ দিন পূরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এই জন্য যে জায়গায় চাঁদ দেখার

([১৪১]) মাজমূউ ফাতাওয়া অরাসাইল, ইবনে উষাইমীন ১৯/৪৫
([১৪২]) আল-মুগনী ৪/৩২৯
([১৪৩]) বুখারী ১৯০৭, মুসলিম ১০৭০নং ইবনে উমার কর্তৃক।

প্রমাণ প্রকৃতার্থে অথবা মানগতভাবে পাওয়া যাবে, সে জায়গার লোকেদের জন্য (রমযানের চাঁদ হলে) রোযা রাখা এবং (শওয়ালের চাঁদ হলে) ঈদ করা ওয়াজেব হবে। আর এ কথা ভৌগোলিকভাবে সর্বসম্মত যে, একই দিনে সারা বিশ্বে চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। বরং উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে এক অথবা দুই দিনের পার্থক্য হতে পারে; যেমন বাস্তবে তা দেখাও যায়। এই জন্য যদি কোন জায়গায় চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সে জায়গার উদয়স্থল অন্য আর এক জায়গার উদয়স্থল থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে, ঐ জায়গাতেও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়েছে। বরং সত্য এই যে, সেখানে চাঁদ দেখার ব্যাপারটা না প্রকৃতার্থে, আর না-ই মানগতভাবে প্রমাণিত। সেই জন্য সেখানে রোযা বা ঈদও ওয়াজেব হবে না।

এই দলীলের উপরও সেই আপত্তি করা হয়েছে, যা পূর্বোক্ত দলীলের উপর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ ব্যাপক। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেননি, বরং নির্দেশকে চাঁদ দেখার সাথে দায়বদ্ধ করেছেন। এই জন্য দুনিয়ার যে কোনও জায়গাতে চাঁদ দেখা গেলে তার উপর আমল করা আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল সে খবর নির্ভরযোগ্য মাধ্যম দ্বারা পৌঁছতে হবে।

উক্ত আপত্তির জবাব তাই দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বোক্ত আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে। আর তা এই যে, এ নির্দেশ সেই সকল লোকেদের জন্য, যারা একই উদয়স্থলের সীমানায় বসবাস করে। কিন্তু যারা উদয়স্থলের সীমানার বাইরে, তাদের জন্য এ কথা বলা যাবে না যে, তারা প্রকৃতার্থে অথবা মানগতভাবে চাঁদ দর্শন করেছে। [১৪৪]

(২) মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ».

“চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা গণনা (ত্রিশ) পূরণ না করা পর্যন্ত তোমরা মাসকে আগেভাগে বরণ করো না। অতঃপর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা গণনা

([১৪৪]) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ মাজমূউ ফাতাওয়া অরাসাইল, ইবনে উষাইমীন ১৯/১৫-১৮

(ত্রিশ) পূরণ না করা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখো।" [১৪৫]

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ রোযা ওয়াজেব হওয়ার জন্য চাঁদ দেখার সাথে এ শর্তও আছে যে, রমযান মাস প্রবেশ করার পূর্বে যেন রোযা না রাখা হয়। তদনুরূপ ঈদ করার জন্য চাঁদ দেখার সাথে এ শর্তও আছে যে, রমযান মাস পার হয়ে যায়। এখন যদি উদয়স্থলের ভিন্নতাকে প্রভাবশালী না মানা হয়, যা একটি ভৌগোলিক প্রকৃতত্ব ও অনায়াসবোধ্য বিষয়, তাহলে এই সমস্যা দেখা দেবে যে, পৃথিবীর কিছু এলাকাতে রমযান শুরু হওয়ার আগেই রোযা রাখা হবে এবং রমযান পুরো হওয়ার আগেই ঈদ করা হবে।

যুক্তির দলীল ঃ

উদয়স্থল-ভিন্নতার সমর্থক উলামাগণ একটি যুক্তিও পেশ করেন যে, এ কথা সকলের নিকট বিদিত যে, ভূপৃষ্ঠের পূর্ব দিকে অবস্থিত এলাকাসমূহে পশ্চিমে অবস্থিত এলাকাসমূহের আগে ফজর উদয় হয়। অর্থাৎ, আমাদের আগে পূর্ব দিকের দেশগুলিতে আগে ফজর উদয় হয়, যখন আমাদের নিকট তখনও রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। একইভাবে আমাদের পূর্ব দিকের এলাকায় যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন আমাদের নিকট দিনের একাংশ অবশিষ্ট থাকে। পূর্ব দিকের এলাকায় মুসলিমদের একটি বড় জামাআতের নিকট ফজর উদয় হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে রোযাদারদের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়, তাহলে কি আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখবে, তাদের জন্যও পানাহার হারাম হয়ে যাবে? একইভাবে যখন আমাদের পূর্ববর্তী এলাকায় সূর্য ডুবে যাবে, তখন আমাদের জন্যও ইফতার করা বৈধ হবে; যদিও আমাদের এখানে এখন আসরের সময়? নিশ্চিতভাবে উত্তর না-সূচক হবে। চাঁদ সূর্যেরই মতো। কেননা চাঁদ হল মাস-কালের বিবরণ এবং সূর্য হল দিন-কালের বিবরণ। আর যে সত্তা বলেছেন,

{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (١٨٧) سورة البقرة

"আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা)

([১৪৫]) আবূ দাঊদ ২৩২৮, নাসাঈ ২১২৬, ইবনে খুযাইমা ১৯১১, ৩/২০৩ হুযাইফা কর্তৃক, একই অর্থে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীস দেখুন ঃ আবূ দাঊদ ২৩২৯, নাসাঈ ২১৩০, ইবনে খুযাইমা ৩/২০৩

হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)*

সে সত্তাই বলেছেন,

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٨٥) سورة البقرة

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*[১৪৬]

উক্ত দলীলের উপর এই আপত্তি তোলা হয়েছে যে, রোযা ও ঈদের ব্যাপারে ব্যাপক নির্দেশ হল, "চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে ঈদ কর।" সুতরাং যখন উম্মতের একটি ব্যক্তি বা একটি জামাআতের চাঁদ দেখার ফলে চাঁদ দেখার বিষয় প্রমাণিত হল, তখন রোযা ও ঈদ ওয়াজেব হওয়ার কথাও প্রমাণিত হল। পক্ষান্তরে সূর্য ঢলা ও অস্তের ব্যাপারটা আলাদা। যেহেতু শরীয়তের কোন স্পষ্ট উক্তিতে কেবল তার নামে কোন ব্যাপক নির্দেশ দায়বদ্ধ করা হয়নি।[১৪৭]

কিন্তু উক্ত আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, কিছু শরয়ী স্পষ্ট উক্তিতে কোন কোন ইবাদতকে সূর্যের পরিভ্রমণের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٧٨) سورة الإسراء

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন (নামায); ফজরের কুরআন (নামায) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮)*[১৪৮]

উক্ত দলীলের উপর একটি আপত্তি এও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ওয়াজেব হওয়া এবং ওয়াজেব আদায় করার মাঝে পার্থক্য আছে। ওয়াজেব আদায় করার ব্যাপারে তো উদয়স্থল ও সময়ের পার্থক্য আসে, কিন্তু ওয়াজেব হওয়ার সময়ে পার্থক্য আসে না। যেমন জুমআর নামায জুমআর দিনেই পড়া

([১৪৬]) মাজমূউ ফাতাওয়া, শায়খ ইবনে উষাইমীন ১৯/৪৮
([১৪৭]) ফাতহুল ক্বাদীর ২/৩১২, তানবীহুল গাফিল ১০৮পৃঃ
([১৪৮]) মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৪৭

হয় এবং সারা বিশ্বে জুমআর দিনেই তা পড়া হয়। অবশ্য উদয়-অস্তের সময়ে পার্থক্যের কারণে আদায় আগে-পিছে হয়ে থাকে। ঠিক অনুরূপই রোযা সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর একই দিনে ওয়াজেব হয় এবং ঈদের দিন সকল মুসলমানের জন্য একটাই হয়, কিন্তু সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে এবং এলাকার পার্থক্যের কারণে পালনে আগা-পিছা হয়।[১৪৯]

এই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, আসল সমস্যাটা ওয়াজেবের সময় নিয়েই। অর্থাৎ, রোযা ওয়াজেব সেই সময়ে হবে, যে সময় রমযান মাসের চাঁদ প্রকৃতার্থে বা মানগতভাবে দেখার কথা প্রমাণিত হবে অথবা শা'বানের গণনা ৩০ পূর্ণ হয়ে যাবে। এইভাবে ঈদের দিন সেই দিন হবে, যেদিন শওয়ালের প্রথম তারীখ হবে। অতএব যখন রমযান মাস শরয়ীভাবে বা বাস্তবে প্রবেশই করল না, তখন ওয়াজেব হওয়ার সময়ের প্রশ্নই আসে না। অবশ্য যে এলাকার উদয়স্থল অভিন্ন, সে এলাকায় ওয়াজেব হওয়া ও ওয়াজেব আদায় করার মাঝে পার্থক্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় মত ঃ

কোন জায়গার দর্শন কেবল সেই এলাকার সীমানার জন্য মান্য হবে। যত দূরের জন্য বলা যাবে যে, যদি মেঘ বা ধুলোবালি ইত্যাদির বাধা না হতো, তাহলে সেখানেও চাঁদ অবশ্যই দেখা যেত।

আমার বুঝে মনে হয়, এ মতটিও পূর্বোক্ত মতটির কাছাকাছি। অর্থাৎ, উদয়স্থল-ভিন্নতার ক্ষেত্রে অভিন্ন দর্শন মান্য নয়। পক্ষান্তরে উদয়স্থল অভিন্ন হলে দর্শন-অভিন্নতা মানতে হবে। উভয় মতই একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। উভয়ের মধ্যে কেবল অভিব্যক্তির তফাৎ। সম্ভবতঃ এই জন্যই আল্লামা সুবকী (রাহিমাহুল্লাহ) এই মতকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

اعتبار كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم جيد.

"প্রত্যেক শহরের দর্শন মান্য, যেখানে চাঁদ অদৃশ্য থাকার ধারণা না হয়। এ রায় উত্তম।"[১৫০]

কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এটা এমন কোন বিধিব্যবস্থা নয়, যার অনুসরণ করতে

(১৪৯) তুরজুমান পত্রিকা ২য় খন্ড, ৪০-৪১ সংখ্যা, ১৪পৃঃ
(১৫০) আল-আলামুল মানশূর ১৫পৃঃ

লোকেদেরকে বাধ্য করা হবে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

তৃতীয় মত ঃ

যতদূর গেলে নামায কসর করা বৈধ, ততদূর পর্যন্ত অভিন্ন-দর্শন গণ্য হবে। এ মতের দলীল এই যে, যেহেতু শরীয়তে সে দূরত্বের কোন সীমাবদ্ধতা নেই যে দূরত্ব পর্যন্ত চাঁদ দেখার খবর মান্যতা পাবে এবং যার পর পাবে না, এ ব্যাপারে উদয়স্থলের পার্থক্য গণ্য করা আসলে জোতির্বিদ ও পঞ্জিকা-ওয়ালাদের কথা মেনে নেওয়া, অথচ তাদের কথা মান্য করা শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেহেতু নামায কসরের দূরত্ব গণ্য করা জরুরী। কেননা, শরীয়ত কিছু ইবাদতের জন্য কসরের দূরত্বকে সন্নিবেশিত করেছে। যেমন নামাযের কসর এবং রোযা কাযা করার অনুমতি ইত্যাদি।[১৫১]

এ দলীলের উপর আপত্তি এই করা হয়েছে যে,

প্রথমতঃ শরীয়তে কসরের দূরত্ব-সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়নি। এই জন্য তাতেও উলামাগণের বিভিন্ন মতামত আছে। এমনকি কিছু উলামার নিকট ৯ মাইল দূরত্বে কসর করা জায়েয। যাহেরিয়া মযহাবে তিন মাইল দূরত্বে কসর করা জায়েয। অথচ এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, ৩ মাইল বা ৯ মাইল দূরত্বে চাঁদ দেখা গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়তঃ চান্দ্র-তিথি বিদ্যা ও নক্ষত্র বিদ্যা দুটি পৃথক পৃথক বিদ্যা। যে নক্ষত্র বিদ্যার কথা শুনতে ও সেই অনুযায়ী আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হতে আধুনিক চান্দ্র-তিথি বিদ্যা স্বতন্ত্র। বরং এ কথা বলা যায় যে, বর্তমানে উদয়স্থল-ভিন্নতা একটি ভৌগোলিক প্রকৃতত্ব, যার সম্পর্ক সে দূরত্বের সাথে নেই, যাতে নামায কসর করা যায়।[১৫২] বরং তার সম্পর্ক ভূগোলকের দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখার সাথে, যার সবিস্তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই শহরের মাঝে কসরের দূরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু উদয়স্থল ভিন্ন নাও হতে পারে। যেহেতু উভয় শহরই একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত; যেমন মস্কো ও রিয়ায।[১৫৩]

(১৫১) আল-মাজমূ' ৬/২৩৭, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ৩/৫২, আল-আলামুল মানশূর ২৮পৃঃ
(১৫২) মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৫/ ১০৪
(১৫৩) মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৫২-৫৩

তৃতীয়তঃ খোদ শাফেয়ী উলামাগণ এ মতকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা সুবকী লিখেছেন, 'চাঁদের অভিন্ন-দর্শনের ব্যাপারে কসরের দূরত্বকে বিবেচ্য বানানো দুর্বল মত।' (১৫৪)

চতুর্থ মত ঃ

একটি প্রদেশ বা রাজ্যের যে কোন জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে তা সারা প্রদেশ বা রাজ্যের জন্য যথেষ্ট।

এ মতের দলীল ঐ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর হাদীস।

দলীল গ্রহণের পদ্ধতি ঃ যেহেতু শাম একটি প্রদেশ ছিল এবং হিজায ছিল অন্য প্রদেশ। সেহেতু হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ শাম প্রদেশের চাঁদ দেখাকে মান্য করেননি। (১৫৫)

উক্ত দলীলের উপর আপত্তি আনা হয়েছে যে,

প্রথমতঃ বিবেচনাসাপেক্ষ যে, প্রদেশের সীমাবদ্ধতা কী? (১৫৬) এর সঠিক পরিমাপ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং যতক্ষণ কোন জিনিসের সঠিক নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ তাকে কোন বিধানের বুনিয়াদ বানানো কীভাবে সম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে এ কথা বাস্তবরূপে প্রমাণিত যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা বা অভিন্নতার সম্পর্ক প্রদেশ বা রাজ্যের সাথে আদৌ নয়, বরং তার সম্পর্ক ভূগোলকের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সাথে।

তৃতীয়তঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ যখন কুরাইবের খবর প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন এ কথা বলেননি যে, যেহেতু শাম একটা প্রদেশ এবং হিজায অন্য প্রদেশ, সেহেতু সেখানকার দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণেই আল্লামা সুবকী এই মতকেও দুর্বল বলেছেন। (১৫৭)

পঞ্চম মত ঃ

একই রাষ্ট্রনেতার শাসনাধীনে বসবাসকারী সকল দেশবাসীর জন্য এক জায়গার চাঁদ যথেষ্ট হবে।

(১৫৪)আল-আলামুল মানশূর ২৯পৃঃ, আল-মাজমূ' ৬/৩৩৭
(১৫৫) ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ২৭৮পৃঃ, মা'রিফাতু আওক্বাতিল ইবাদাত ২/৫৩
(১৫৬) মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৫/ ১০৪
(১৫৭) আল-আলামুল মানশূর ২৯পৃঃ

এ মতের সমর্থকদের কাছে কোন শরয়ী দলীল নেই। অবশ্য তাঁরা বলেন, একজন রাষ্ট্রনেতার শাসনাধীনে যত শহর ও গ্রাম থাকে, তা শাসকের নিকট একটি শহরের মতো। যেহেতু তার আইন সারা রাষ্ট্রে বহাল হয়। (১৫৮) এ মতটি চতুর্থ মতের কাছাকাছি। সম্ভবতঃ সেই জনই আল্লামা সুবকী এটি উল্লেখ করেননি। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধেও কিছু আপত্তি আছে ঃ-

প্রথমতঃ উক্ত যুক্তির পশ্চাতে কোন শরয়ী দলীল নেই।

দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ যখন হযরত কুরাইবের খবরকে রদ্দ করেছিলেন, তখন হিজায শামদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি প্রদেশ ছিল এবং মুসলিমদের রাষ্ট্রনেতা অভিন্ন খলীফা ছিলেন হযরত মুআবিয়া ﷺ। কিন্তু না হযরত মুআবিয়া ﷺ সে ব্যাপারে হিজাযবাসীদের উদ্দেশ্যে কোন নির্দেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন, আর না হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ শামের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ পূর্ণ ইসলামী ইতিহাসে এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, খুলাফায়ে রাশেদীন অথবা পরবর্তীর কোন বাদশা চাঁদের ব্যাপারে লোকেদেরকে খিলাফতের কেন্দ্র শহর অথবা রাষ্ট্রের অন্য কোন শহরের অনুসারী বানিয়েছেন।

চতুর্থতঃ একই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আয়তন বিশাল হলে উদয়স্থল ভিন্ন হতে পারে, যেমন বাস্তবে তা পরীক্ষিত।

বর্তমানে সঊদী আরবে এ মতের উপর আমল চলছে। দলীল হিসাবে যদিও এ মতটি দুর্বল, তবুও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি সবল। (১৫৯) এই জন্য যদি কোন ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে, যে দেশে এই মতের উপর আমল জারী আছে, তাহলে তার বিরোধিতা করা সঙ্গত নয়।

ষষ্ঠ মত ঃ

নামাযের সময় ভিন্ন হলে চাঁদের খবর গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থাৎ, দুই শহরের মাঝে যদি এতটা দূরত্ব থাকে, যাতে এক শহরে

(১৫৮) আল-কাফী, ইবনে আব্দিল বার্র ১/২৩৫, ত্বারহুত তাষরীব ৪/ ১১৬-১১৭
(১৫৯) আশ্-শারহুল মুমতি', ইবনে উষাইমীন ৬/৩২৩

যোহরের নামাযের সময় হলে অন্য শহরে আসর বা মাগরেবের সময় হয়, তাহলে উভয় শহরের মাঝে চাঁদে পার্থক্য মানতে হবে।[১৬০]

এ মত আসলে কোন স্বতন্ত্র মত নয়, বরং উদয়স্থলের পার্থক্যের ফলে সীমার বিবরণ। অর্থাৎ, যদি দুই শহরের মাঝে এতটা দূরত্ব হয়, যাতে এক শহরে এক নামাযের সয়ম হল এবং দ্বিতীয় সময়ে দ্বিতীয় নামাযের সময় হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উদয়স্থল পার্থক্য হতে পারে, নচেৎ নয়। এরই কাছাকাছি ফুক্বাহাদের একটি মত এই যে, যদি দুই শহরের মাঝে এক মাস পথের দূরত্ব থাকে, তাহলে উদয়স্থল ভিন্ন মানা হবে, নচেৎ নয়।[১৬১]

উক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি আসে যে, প্রথমতঃ এর সপক্ষে কোন দলীল নেই। উদয়স্থলের ভিন্নতার সম্পর্ক দূরত্বের সাথে নয়, বরং ভূগোলকের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সাথে। যেমন 'উদয়স্থলের ভিন্নতা' শিরোনামে এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম মত ঃ

একই রাতে খবর পৌঁছানো যায় এমন দূরত্বে চাঁদের খবর মানা যাবে।

যদি কোন জায়গায় চাঁদ দেখার শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে চারিপাশে রাতারাতি যত দূরে তার খবর পৌঁছানো সম্ভব হয়, তত দূরের জন্য সে খবর গ্রহণযোগ্য হবে, তার বাইরের এলাকার জন্য নয়।[১৬২]

বাহ্যতঃ এ মতের উদ্দেশ্য এই বুঝা যায় যে, যেহেতু চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি ক'রে রোযা রাখা অথবা ছাড়া হয়, সেহেতু রোযার সময় শুরু হওয়ার আগে আগে যত দূরে খবর পৌঁছতে পারে, তত দূর পর্যন্ত সেই এলাকায় চাঁদের খবর মান্য হবে। কেননা, যদি রোযা শুরু করার আগে সে খবর না পৌঁছে, তাহলে চাঁদের সে খবরে বাস্তবিক কোন উপকার হবে না।

(১৬০) সমসাময়িক কালের আল্লামা আবূ সাঈদ শরফুদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'আল-ইতিস্বাম'-এর বিশেষ ফতোয়ানবিশ মওলানা সানাউল্লাহ মাদানী এই ফতোয়া দিয়েছেন। (আল-ই'তিস্বাম ৪৭ খন্ড, ৩য় সংখ্যা) প্রাচীন কোন কোন ফক্বীহও এ কথা বলেছেন। তবে লেখার সময় কিতাবের নাম আমার স্মৃতিতে নেই।

(১৬১) আল-মিরআত ৬/৪৩৬-৪৩৭, তানবীহুল গাফেল ১০৫পৃঃ)

(১৬২) আশ্-শারহুল মুমতি', ইবনে উষাইমীন ৬/৩২৩

সম্ভবতঃ উক্ত মতটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)র নিম্নোল্লিখিত উক্তির সারসংক্ষেপ,

الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْ رُئِيَ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَهُمْ خَبَرُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رُئِيَ فِي بَلَدِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ .

অর্থাৎ, সঠিকতার কাছাকাছি এই মত যে, যদি চাঁদ কোন এমন নিকটবর্তী জায়গায় দেখা যায়, যেখান থেকে প্রথম দিনেই লোকেদেরকে খবর পৌঁছানো সম্ভব, তাহলে সেটা এমন ব্যাপার, যেমন তাদের এলাকাতেই চাঁদ দেখা গেছে অথচ তাদের কাছে সে খবর পৌঁছেনি।[১৬৩]

উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি আসে যে,

প্রথমতঃ এ হল সেই সময়কার কথা, যে সময়ে খবর প্রচারের মাধ্যম সাধারণ ও স্বাভাবিক ছিল এবং বর্তমানের মতো দ্রুতগামী বৈদ্যুতিন মাধ্যম বিদ্যমান ছিল না। এই জন্য উক্ত মত কোন বিধিব্যবস্থা হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন-হাদীস ও সলফে সালেহীনদের উক্তিতে তার সপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ ইতিহাস গ্রন্থে বা কারো জীবনী গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, মুসলিম শাসকগণ চাঁদ দেখার পর তার খবর চারি দিকে প্রেরণ করেছেন।

(১৬৩) মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/ ১০৬

চতুর্থ অধ্যায়
সঠিক মত এবং লেখকের অভিমত

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় দুটি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়েছে ঃ-

১। চান্দ্র মাহিনার প্রমাণ জোতির্বিদ্যা দ্বারা হবে, নাকি চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা?

২। সারা মুসলিম বিশ্বের জন্য অভিন্ন দর্শন গণ্য, নাকি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন?

প্রথমোক্ত বিষয়ে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং উল্লিখিত উলামায়ে কিরামের উক্তিসমূহের আলোকে অনিবার্যরূপে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, চান্দ্র মাস প্রমাণের জন্য চাঁদ দেখা যাওয়া অথবা গণনা ৩০ পূর্ণ হওয়া জরুরী। আজ পর্যন্ত গণ্যমান্য উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য আছে যে, এ ব্যাপারে হিসাব-বিদ্যা বা জোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে আল্লামা আহমাদ শাকের এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের এই অভিমত যে, বর্তমানে জোতির্বিদ্যায় নির্ভর ক'রে চান্দ্র মাসকে গ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য ওয়াজেব, তা এমন একটি অভিমত, যা তাঁর পূর্বে দ্বীনের কোন আলেম পোষণ করেননি। আর সত্যি কথা এই যে, যদি আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্তিসমূহকে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা হয়, তাহলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, তিনি নিজ উক্ত অভিমত থেকে রুজু করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে বলা যায় যে, সারা বিশ্বের এক জায়গায় চাঁদ দেখে সকলের রোযা-ঈদ হবে কি না, এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের দলীল ও যুক্তি তুলনা ও সমীক্ষা ক'রে দেখার পর সঠিক মত এই প্রমাণ হয় যে, উদয়স্থল অভিন্ন হওয়ার শর্তে এক জায়গার দেখা চাঁদে রোযা-ঈদ চলবে। কিন্তু উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদ দেখে রোযা-ঈদ করতে হবে। এই মতটিই দলীল ও যুক্তির আলোকে শক্তিশালী বলে মনে হয়।

লেখকের পড়াশোনা অনুযায়ী মনে হয়, এই মত অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন এবং ফুক্বাহাদের একটি বড় জামাআতের। কিন্তু যেহেতু সাধারণভাবে ফুক্বাহা ও অধুনা কালের কিছু গ্রন্থপ্রণেতা উক্ত মতকে অধিকাংশ উলামার বিরোধী বলে থাকেন, সেহেতু এ ব্যাপারে কিছু কথা লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমতঃ এ কথা জরুরী নয় যে, যে মত অধিকাংশ উলামার হবে, সে মত সঠিকতার বেশি নিকটবর্তী ও দলীল হিসাবে বেশি শক্তিশালীও হবে। যেমন এ

কথা (শরয়ী) ইল্মী দুনিয়ায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিদিত নয়। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালের সত্যানুসন্ধানী বহু আহলে হাদীস আলেম একাধিক বিষয়ে বলিষ্ঠ দলীলের ভিত্তিতে অধিকাংশ উলামার বিরোধী মত অবলম্বন করেছেন। যেমন তিন তালাক, বিশ রাকআত তারাবীহ ইত্যাদি। আমার এ কথা লেখার উদ্দেশ্য আদৌ এই নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতামতকে গুরুত্ব দিই না। বরং একজন তালেবে ইল্ম হয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা এই যে, সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতকে চ্যালেঞ্জ করা কোন সহজ কাজ নয়। যেমন ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা না ক'রে ছোট আলেম ও তালেবে ইল্মদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়। অবশ্য যেখানে দলীল দিবালোকের মতো স্পষ্ট, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, বরং দলীলের বলিষ্ঠতা মান্য করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বহু সংখ্যক লেখক যখন কোন মাসআলার ব্যাপারে বলেন যে, এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মত অথবা এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত, তখন অধিক সময় তাতে নিজের রায়ের প্রতি প্রবণতা থাকে। ঘটে এই যে, যখন কোন ফক্বীহ বা আলেম নিজ তাহক্বীক্ব ও ইলমের ভিত্তিতে কোন মাসআলাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মত বলে অভিহিত করে অথবা তাতে সর্ববাদিসম্মতি (ইজমা) আছে বলে প্রকাশ করে, তখন পশ্চাদ্‌বর্তী উলামাগণ বিনা তাহক্বীক্ব ও বাছ-বিচারে সেই কথা বা উদ্ধৃতির উপর নির্ভর ক'রে বসে। অথচ তাহক্বীক্বের পর জানা যায় যে, এখানে হয় 'সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা' শব্দ প্রয়োগ করা ভুল, না হয় চার ইমামের অন্ধানুকরণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা উদ্দেশ্য। (সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীন নয়।)

হালফিল আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপার দেখুন, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা-ঈদ পালন করার সমর্থকরা বড় বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় বলে থাকেন বা লিখে থাকেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা বা মুহাদ্দিসীন অভিন্ন-দর্শনের পক্ষে।[(১৬৪)] অথচ এ মাসআলায় তাহক্বীক্বী (সত্যানুসন্ধিৎসা) দৃষ্টি দেওয়ার পর

---

(১৬৪) এর একটি নিকটবর্তী উদাহরণ নিন। দিল্লী থেকে প্রকাশিত তুরজুমান পত্রিকার ২২ খন্ড, ৪০-৪১ সংখ্যা ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম ছিল 'এক দেশের চন্দ্র-দর্শন'। (পরবর্তীতে জানা গেল জনাব প্রবন্ধকার এ ব্যাপারে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন এবং তাতেও একই কথা লিখেছেন।) জনাব প্রবন্ধকার নিজ প্রবন্ধে এ কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনের মত এটাই। বরং

আরো অগ্রসর হয়ে জনাব লেখক তাঁর বিরোধীদেরকে 'হঠকারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। (লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।) অথচ এ প্রবন্ধ লেখকের নিজস্ব তাহক্বীক্ব নয়। (আর দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কিছু গ্রন্থ-প্রণেতা ও প্রবন্ধকারদের ভিতরে এ রোগ বেড়ে চলেছে।) অথবা তিনি ইলমী তাহক্বীক্বের হকই আদায় করেননি। নিম্নোল্লিখিত পয়েন্টগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে যার অনুমান করা যায়।

১। তিনি লিখেছেন, "উল্লিখিত প্রবন্ধের সমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নে উল্লিখিত উলামা, ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনের রায় সম্মুখে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীন এই মত পোষণ করেছেন যে,----"

এ উক্তি কী পরিমাণ সত্যতার উপর ভিত্তিশীল, তার প্রকৃতত্ব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। লেখক দ্বিতীয় নাম হিসাবে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ)র কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং 'আল-মুসাওয়া শারহুল মুঅত্ত্বা'র হাওয়ালায় লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) কেবল চাঁদ দেখা গেছে এমন দেশ এবং তার নিকটবর্তী দেশসমূহের জন্য দর্শন গণ্য করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) এক দেশের চন্দ্র দর্শনকে অন্য সকল দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন।"

এখন প্রশ্ন এই যে, কেবল দুটি মত উদ্ধৃত ক'রে শাহ সাহেবের মত কীভাবে জেনে নেওয়া হল? কেননা, শাহ সাহেবের লেখাতে কোন একটি মতের দিকে প্রবণতার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই।

৩। লেখক তৃতীয় নাম নিয়েছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)র এবং দলীলস্বরূপ 'মাজমূউল ফাতাওয়া' থেকে একটি অবিশদ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। অথচ শায়খুল ইসলাম উদয়স্থল-ভিন্নতা ও তার গণ্যতার মত অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তিনি 'আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ' (১০৬পৃঃ)তে লিখেছেন,

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد.

অর্থাৎ, জ্যোতির্বিদদের ঐকমত্যে উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে থাকে। উদয়স্থল অভিন্ন হলে রোযা রাখা ওয়াজেব হবে, নচেৎ না। শাফেয়ী মযহাবের সবচেয়ে সঠিক মত এটাই। আর আহমাদের মযহাবে একটি মত এরই সমর্থক।

৪। লেখক চতুর্থ নাম নিয়েছেন ইমাম শাওকানীর। আর তাতেও তিনি হকের কাছে আছেন।

৫। লেখক পঞ্চম নাম নবাব সিদ্দীক হাসান সাহেবের নিয়েছেন। এতে দুটি আপত্তি আছে ঃ-

প্রথমতঃ 'আর-রাউয্বাতুন নাদিয়্যাহ'-এর হাওয়ালাতে যে বাক্যাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা নবাব সাহেবের নয়; বরং ইমাম শাওকানীর বাক্য, যার ব্যাখ্যা নবাব সাহেব করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত কিতাবে নবাব সাহেবের প্রবণতা বাহ্যতঃ অভিন্ন দর্শনের প্রতি মনে হলেও তাঁর দ্বিতীয় কিতাব 'ফাতহুল আল্লাম' (যা 'আর-রাওয্বাতুন নাদিয়্যাহ'র পরে লেখা।

দেখুন মুক্বাদ্দামাহ, ফাতহুল আল্লাম ১/৮) দেখলে বুঝা যায় যে, নবাব সাহেব অভিন্ন-দর্শনের মতাবলম্বী নন। সুতরাং তিনি লিখেছেন,

وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ لَيْسَ عَلَى أَحَدِهَا دَلِيلٌ نَاهِضٌ وَالْأَقْرَبُ لُزُومُ أَهْلِ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْجِهَاتِ الَّتِي عَلَى سَمْتِهَا....

অর্থাৎ, মাসআলায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যার একটির সপক্ষেও বলিষ্ঠ দলীল নেই। সঠিকতার নিকটবর্তী হল, যে দেশে চাঁদ দেখা যাবে, সে দেশ এবং একই দিকের তার লাগালাগি দেশের লোকেদের জন্য আমল আবশ্যক হবে। (ফাতহুল আল্লাম ২/৬৯০) (এই বাক্যাবলীই রয়েছে সানআনীর সুবুলুস সালাম ৩/২৯৯ এ।---অনুবাদক)

৬। লেখক ষষ্ঠ নাম আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)র নিয়েছেন। তাতে তিনি হকের পাশে আছেন।

৭। লেখক সপ্তম নাম কাসীমের আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বিন উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)র নিয়েছেন। যদি তিনি এটা না করতেন।

উক্ত প্রবন্ধকার লিখেছেন, সঊদী আরবের মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন উষাইমীন 'মাজালিসু শাহরি রামায্বান' আরবী কিতাব ১৪ পৃষ্ঠায় একটা ফতোয়া দিয়েছেন, যার অনুবাদ মুখতাসার মাজালিসু রামায্বানের ১২ পৃষ্ঠায় আছে, 'অনুরূপ রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণ হওয়ার পরে উদয়স্থলের গণ্যতা থাকবে না। যেহেতু বিধান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল, উদয়স্থল ভিন্নতার উপর নয়। নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা কর, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।"

প্রবন্ধকার একই কথা লিখেছেন নিজ পুস্তিকা 'মক্কা মুকার্রামা কী রুয়াত'-এও। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেখানে আরবী বাক্যাবলীও নকল ক'রে দিয়েছেন।

লেখকের উক্ত বাক্যাবলীতে একাধিক সমালোচনা আছে। কিন্তু সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে অন্য সব উপেক্ষা ক'রে কেবল অনুবাদের ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সবার আগে আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ)র বাক্যাবলী পাঠকের সামনে রাখি।

আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত বাক্-ধারাবাহিকতায় বলছেন যে, রমযান প্রবেশের বিধান দুইভাবে প্রমাণিত হবে, এক ঃ চাঁদ দেখে। দুই ঃ শা'বানের ৩০ দিন পূরণ ক'রে।

চাঁদ দেখা, তা প্রমাণ হওয়ার শর্তাবলী, চাঁদ দর্শকের দায়িত্ব, সরকারের তরফ থেকে চাঁদ দেখার কথা ঘোষণা হওয়ার পরে সেই অনুযায়ী আমল ওয়াজেব ইত্যাদির বিবরণ দেওয়ার পর লিখেছেন,

وإذا ثَبتَ دخولُ الشهر ثبوتاً شرْعيَّاً فَلاَ عِبْرةَ بمنازل القمر؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّقَ الحكْم برؤيةِ الهلالِ لا بمنَازلِهِ، فقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأيتُمُ الهلالَ فصُوموا وإِذَا رَأَيْتُمُوه فأفْطِروا»، متفق عليه.

বুঝা যায় যে, এ দাবী সঠিক নয়। পরন্তু এ কথা বলা সঠিক যে, সকল না হলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন এ মাসআলায় এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বে রোযা-ঈদ পালন করার বিপক্ষে। যেমন হাদীসগ্রন্থসমূহে চোখ বুলালে সে কথা জানা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর হাদীস, যা অভিন্ন-দর্শন যথেষ্ট না

"যখন (রমযান) মাস প্রবেশ করার কথা শরয়ীভাবে প্রমাণিত হবে, তখন চন্দ্র-কক্ষের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কেননা, আল্লাহর রসূল ﷺ মাস প্রবেশের বিধানকে চাঁদ দেখার সাথে বিন্যস্ত করেছেন, চন্দ্র-কক্ষের সাথে নয়। সুতরাং তিনি বলেছেন, "চাঁদ দেখলে তোমরা রোযা কর এবং চাঁদ দেখলে তোমরা রোযা ছাড়।" *(বুখারী-মুসলিম, মাজালিসু শাহরি রামাযান ১৪পৃঃ)*

আমার বুঝ মতে আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) এ কথা সেই লোকেদের প্রতিবাদে লিখেছেন, যারা চাঁদ দেখার উপর নির্ভর না ক'রে জোতির্বিদদের উপর নির্ভর ক'রে থাকে। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রবন্ধকার শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ)র বক্তব্যের উদ্দেশ্যকেই অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি শায়খ ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)র 'মানাযিলুল ক্বামার' (চান্দ্র-কক্ষ)র কার্যকারিতা নেই---এর জায়গায় প্রবন্ধকার অনুবাদ করেছেন, 'মাত্বালিউল ক্বামার' (উদয়স্থল)এর কোন কার্যকারিতা বা গণ্যতা নেই!

শায়খ ইবনে উষাইমীন লিখেছেন,

عَلَّقَ الحكْم برؤيةِ الهلالِ لا بمَنَازِلِهِ...

"মাস প্রবেশের বিধানকে চাঁদ দেখার সাথে বিন্যস্ত করেছেন, চন্দ্র-কক্ষের সাথে নয়।"

কিন্তু প্রবন্ধকার এর অনুবাদ করেছেন, "বিধান চাঁদ দেখার উপর বিন্যস্ত, উদয়স্থল-ভিন্নতার উপর নয়।"

অর্থাৎ, তিনি 'মানাযিল'-এর অনুবাদ করেছেন 'মাত্বালি'---এটা তো একটা ভুল। যেহেতু কক্ষ ও উদয়স্থল দুটি আলাদা জিনিস।

আর দ্বিতীয় ভুল ঃ তিনি উদয়স্থলের সাথে 'ভিন্নতা' শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে নিজের দাবী প্রমাণ করা যায়।

অনুবাদের এ ভুল প্রবন্ধকারের জলদিবাজির কারণে ঘটেছে অথবা তা অন্য কারো অনুবাদের উপর ভরসা করার পরিণাম।

ভাববার বিষয় যে, প্রবন্ধকার নিজের রায়ের সমর্থনে সাত ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তিনি হকের গন্ডিতে আছেন। তাহলে কোন দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি বলছেন যে, "কতিপয় আলেম এ মাসআলায় হঠকারিতা প্রদর্শন ক'রে চট্ ক'রে বলে দেন----।"

سبحانك هذا بهتان عظيم.

হওয়ার দলীল, তা যে যে মুহাদ্দিস স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সকলেই সে হাদীসকে এ কথার দলীলরূপে উল্লেখ করেছেন যে, এক জায়গার দর্শন অন্য জায়গার জন্য গণ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

১। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ সুনানে বাব (পরিচ্ছেদ)এর শিরোনাম বেঁধেছেন,

باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم

"পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক শহরের লোক নিজেদের দর্শনের উপর নির্ভর করবে।" (১৬৫)

উক্ত বাবে কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের সেই হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম তিরমিযী লিখেছেন,

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাসের হাদীস হাসান সহীহ গরীব। আহলে ইল্‌মের এ হাদীসের উপর আমল আছে যে, প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য নিজস্ব (চাঁদ) দর্শন (মান্য হবে)। (১৬৬)

২। সুনানে আরবাআহ (চার সুনান গ্রন্থ)এর আরো এক প্রণেতা ইমাম আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ কিতাব আস্-সুনানুল কুবরা ও আল-মুজতাবা (আস্-সুনানুস সুগরা)তে ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য বাব বেঁধেছেন,

باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

"বাব ঃ দিগন্তবাসীদের চাঁদ দেখায় ভিন্নতা।" (১৬৭)

৩। সুনানে আরবাআহ (চার সুনান গ্রন্থ)এর তৃতীয় লেখক ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য বাব বেঁধেছেন,

(১৬৫) তিরমিযী ৬৯৩নং হাদীস, কিতাবুস স্বাওম ৯নং বাব

(১৬৬) ইমাম তিরমিযীর এই উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর যুগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আহলে ইল্‌মদের মাঝে কোন মতভেদ ছিল না। আর যদিও বা ছিল, তাহলে উল্লেখযোগ্য ছিল না। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

(১৬৭) নাসাঈ কুবরা ২/৬৭, সুগরা ৩/ ১৬, ৫নং বাব

باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة (أي فما الحكم)

"বাব ঃ যখন কোন দেশে অন্যদের এক রাত্রি পূর্বে চাঁদ দেখা যাবে (তখন বিধান কী?)[১৬৮]

৪। সহীহ হাদীসসমূহকে একত্রকারী একজন প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুযাইমা (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ সহীহ গ্রন্থে বাব বেঁধেছেন,

باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم

"বাব ঃ এ বিধানের দলীল যে, প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য নিজস্ব চাঁদ দেখার পর রমযানের রোযা ওয়াজেব, অন্য দেশবাসীর চাঁদ দেখে নয়।"

অতঃপর আলোচ্য ইবনে আব্বাসের হাদীস উল্লেখ করেছেন।[১৬৯]

৫। হাফেয আব্দুল আযীম মুনযিরী (রাহিমাহুল্লাহ) সংক্ষেপিত 'সহীহ মুসলিম'-এ ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য বাব বেঁধেছেন,

باب لكل بلد رؤيتهم

"বাব ঃ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব দর্শন।"[১৭০]

৬। ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে যখন তার বাব প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তিনিও উক্ত ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য শিরোনাম দিলেন,

باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ.

"বাব ঃ প্রত্যেক দেশবাসীর নিজস্ব দর্শন হবে এবং যখন লোকেরা এক দেশে চাঁদ দেখবে, তখন তার বিধান তাদের থেকে দূরবর্তী দেশের জন্য প্রামাণ্য হবে না---এর বিবরণ।"[১৭১]

৭। একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম বুখারীর ব্যাপারে বলেছেন, তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বাব বেঁধেছেন,

(১৬৮) আবূ দাউদ, আবওয়াবুস স্বাওম, ৯নং বাব
(১৬৯) ইবনে খুযাইমা ৩/৩০৫
(১৭০) সংক্ষেপিত সহীহ মুসলিম ১৫৬পৃঃ, তাহক্বীক আলবানী
(১৭১) সংক্ষেপিত সহীহ মুসলিম ১৫৬পৃঃ, তাহক্বীক আলবানী

باب لكل بلد رؤيتهم

"বাব ঃ প্রত্যেক দেশবাসীর নিজস্ব দর্শন।"[১৭২]

৮। ইমাম মাজদুদ দ্বীন ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুন্তাক্বাল আখবার'-এ ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য বাব বেঁধেছেন,

باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟

"বাব ঃ এক দেশের লোক চাঁদ দেখলে বাকী দেশগুলির অধিবাসীর জন্য রোযা রাখা আবশ্যক কি?"[১৭৩]

৯। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল আষীর (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জামেউল উসূল ফী আহাদীষির রাসূল'-এ ইবনে আব্বাসের হাদীসের জন্য বাব বেঁধেছেন,

باب اختلاف البلد في الرؤية

"বাব ঃ চাঁদ দেখায় দেশের ভিন্নতা।"[১৭৪]

১০। সবশেষে সেই মুহাদ্দিস, যাঁকে সবার আগে উল্লেখ করা উচিত ছিল, ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখের ওস্তাদ ইমাম আবূ বাক্র আব্দুল্লাহ বিন আবূ শাইবাহ স্বীয় 'আল-মুস্বান্নাফ ফিল আহাদীষি অল-আষার' গ্রন্থে বাব বেঁধেছেন,

في القوم يرون الهلال ولا يرونه الآخرون

"সে সম্প্রদায়ের বিধান, যারা চাঁদ দেখে এবং অন্যেরা দেখে না।"

অতঃপর তারই নিচে আব্দুল্লাহ বিন সাঈদের একটি আষার উল্লেখ করেছেন এই শব্দে,

ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا: أن أهل أستاره قد رأوه، فقال القاسم وسالم:

(১৭২) ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৪৭১হিঃ) তাফসীর কুরতুবী ২/৭৫৬, হাফেয সুবকী (মৃঃ ৭৫৬হিঃ) আল-আলামুল মানশূর ২৮পৃঃ, ফক্বীহ ক্বারাফী (মৃঃ ৬৮৪হিঃ) আয্-যাখীরাহ ২/৪৯১, প্রকাশ থাকে যে, সহীহ বুখারীর বর্তমান কপিতে উক্ত শিরোনামে কোন বাব নেই। জানি না, এটা বিভিন্ন প্রতিলিপির ভিন্নতা, নাকি উক্ত ইমামগণের ভ্রম। আল্লাহই অধিক জানেন।
(১৭৩) মুন্তাক্বাল আখবার ২/ ১৬২
(১৭৪) জামেউল উসূল ৬/৩২৫

ما لنا ولأهل أستارة.

অর্থাৎ, একদা মদীনায় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আস্তারাবাসীরা চাঁদ দেখেছে। তা শুনে কাসেম (বিন মুহাম্মাদ) ও সালেম (বিন আব্দুল্লাহ) বললেন, 'আমাদের সাথে আস্তারাবাসীর সাথ কী?'[১৭৫]

এ ছিল হাদীস গ্রন্থসমূহের উপর চোখ-বুলানো একটি পর্যালোচনা। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে মুহাদ্দিসীনদের রায় একেবারেই স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, প্রত্যেক এলাকায় নিজ নিজ হিসাবে চাঁদ দেখতে হবে এবং যেখানে চাঁদ হবে, সেখানকার লোকেরা সেই অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে আমার স্মরণ নেই যে, কোন মুহাদ্দিস এই বলে বাবের শিরোনাম বেঁধেছেন,

"বাব ঃ এক জায়গার চাঁদ দর্শন সারা মুসলিম-জাহানের জন্য যথেষ্ট।"

এখান থেকে জানা যায় যে, এক জায়গায় চাঁদ হলে সারা বিশ্বে রোযা-ঈদ হবে---এ মত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীন বা উলামার হতে পারে না। বরং যদি কেবল এ কথা বলা যায় যে, চার মযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহাদের মত এটা, তাহলে সে কথা কোন প্রকারে বিবেচনাযোগ্য হতে পারে।

তৃতীয়তঃ আজকাল যে অর্থে অভিন্ন দর্শনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মত বলে প্রচার করা হচ্ছে, তাও ভেবে দেখবার বিষয়। কেননা, আমার জানা মতে এই ব্যাপক নির্দেশ, চাহে উদয়স্থল ভিন্ন হোক বা অভিন্ন, দূর হোক বা বহু দূর, পূর্ব দিগন্তে হোক বা পশ্চিম দিগন্তে প্রত্যেক জায়গার জন্য এক জায়গার দেখা চাঁদকে যথেষ্ট মনে করা এবং তা বিনা শর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহার মত বলে প্রচার করা ভেবে দেখবার বিষয়। কারণ বহু ফুক্বাহা, যাঁরা এ কথার সমর্থক বা যাদের প্রতি অভিন্ন দর্শনের রায় সম্পৃক্ত করা হয়, তাঁরা এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, উক্ত অভিন্নতার উদ্দেশ্য সে এলাকা নয়, যা দূরে এবং বহু দূরে অবস্থিত।

নিম্নে আমি কতিপয় মালেকী ফুক্বাহার উক্তি উদ্ধৃত করব। যাঁর বিশদ বিবরণ প্রয়োজন এবং অন্যান্য মযহাবের ফুক্বাহাগণের অভিমত জানতে চান, তিনি যেন ফাযীলাতুশ শায়খ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ (রাহিমাহুল্লাহ)র

([১৭৫]) আল-মুস্বান্নাফ ২/৩২৯

পুস্তিকা 'তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইষ্বাতিল আহিল্লাহ' পাঠ করেন।[১৭৬]

১। হাদীস ও ফিক্বহের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র নিজ প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-ইস্তিযকার'-এ লিখেছেন,

قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، والله أعلم.

অর্থাৎ, উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দূর-দূরান্ত শহর যেমন উন্দুলুস থেকে খুরাসান, উভয়ের মধ্যে দর্শন গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শহরের নিজস্ব দর্শন ভিন্ন। তবে একটাই বড় শহর অথবা মুসলিমদের যে দেশের অঞ্চলসমূহ কাছাকাছি, তাদের দর্শন অভিন্ন মানা যাবে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।[১৭৭]

অথচ এই ইমাম ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) নিজের অন্য কিতাব 'আল-কাফী ফী ফিক্বহি আহলিল মাদীনাহ'তে লিখেছেন,

وإذا رأى الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر.

অর্থাৎ, যখন কোন শহর বা দেশে লোকেরা স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখবে অথবা তা দেখার কথা অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে, অতঃপর সে খবর তাদের নিকট থেকে অন্যদের নিকট দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রচারিত হবে, সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য রোযা রাখা আবশ্যক হবে এবং তাদের জন্য রোযা ছাড়া বৈধ হবে না।[১৭৮]

এতদসত্ত্বেও 'ইজমা' (ঐকমত্য)এর দাবী করা এ কথার প্রমাণ যে, কিছু উলামা ও ফুক্বাহা, যাঁরা বলেছেন, এক জায়গায় দেখা চাঁদ দূর ও নিকট প্রত্যেক জায়গার জন্য যথেষ্ট, তাঁদের উদ্দেশ্য মোটেই এ নয় যে, সেই দূরত্ব বলতে উদ্দেশ্য এত দূর, যার ফলে চাঁদের উদয়স্থলই ভিন্ন হয়ে যায়। বরং

([১৭৬]) আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত পুস্তিকায় বিশদ আলোচনার সাথে দলীল ও যুক্তির নিকষে অভিন্ন দর্শনের কথা বাতিল প্রমাণ করেছেন।

([১৭৭]) আল-ইস্তিযকার ১০/৩০

([১৭৮]) আল-কাফী ২/৩৩৪-৩৩৫

তাতে কেবল এতটুকু অবকাশ থাকে যে, ভূগোলকের একই দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত দূর ও নিকটের শহরবাসীদের জন্য চাঁদের প্রমাণ গণ্য হবে।

২। অন্য এক মালেকী ইমাম ইবনে জুযাই কালবী (গুরনাতী, গ্রেন্যাডী) লিখেছেন,

إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقاً للشافعي خلافاً لابن الماجشون، ولا يلزم في البلاد البعيدة كالأندلس والحجاز إجماعًا.

অর্থাৎ, যখন কোন শহরের লোক চাঁদ দেখে নেবে, তখন সমস্ত শহরের লোকেদের জন্য বিধান কার্যকর হবে। এ কথায় শাফেয়ীর সমর্থন রয়েছে, ইবনুল মাজেশূনের বিরোধিতা রয়েছে। অবশ্য (অনেক) দূরবর্তী শহর যেমন উন্দুলুস ও হিজাযের জন্য এ বিধান কার্যকর হবে না। এ ব্যাপারে সকলে একমত।[১৭৯]

৩। তৃতীয় একজন মালেকী ইমাম ইবনে রুশ্দ স্বীয় 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' নামক কিতাবে লিখেছেন,

وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز.

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত যে, দূরবর্তী শহরের মাঝে; যেমন উন্দুলুস ও হিজাযের মাঝে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে না।[১৮০]

৪। আরো একজন মালেকী ফক্বীহ মুহাম্মাদ দুসূক্বী (মৃঃ ১২৩০হিঃ) স্বীকার করেছেন যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে ফুক্বাহাগণ বলেছেন যে, কোন এক জায়গার দেখা চাঁদ দূর ও নিকটবর্তী প্রত্যেক জায়গার জন্য যথেষ্ট, তো এ কথার উদ্দেশ্য অনেক দূরের জায়গা নয়।[১৮১]

৫। অনুরূপ 'মাউসূআতুল ফিক্বহিল মালেকী'র লেখক লিখেছেন,

إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقاً للشافعي خلافاً لابن الماجشون، ولا يلزم البلاد البعيدة جداً كالأندلس والحجاز إجماعًا.

অর্থাৎ, যখন কোন শহরের লোক চাঁদ দেখে নেবে, তখন সমস্ত শহরের লোকেদের জন্য বিধান কার্যকর হবে। এ কথায় শাফেয়ীর সমর্থন রয়েছে,

[১৭৯] আল-ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যাহ ৭৯পৃঃ
[১৮০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ২/৫৬৩
[১৮১] হাশিয়াতুদ দুসূক্বী আলাশ শারহিল কাবীর ২/ ১৩১

ইবনুল মাজেশূনের বিরোধিতা রয়েছে। অবশ্য (অনেক বেশি) দূরবর্তী শহর যেমন উন্দুলুস ও হিজাযের জন্য এ বিধান কার্যকর হবে না। এ ব্যাপারে সকলে একমত।[১৮২]

এই শ্রেণীর আরো উক্তি উদ্ধৃত ক'রে আলোচনাকে দীর্ঘ করতে চাই না। বরং কেবল এ কথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী ফক্বীহগণ যখন বলেছেন যে, এক জায়গার দর্শন দূর ও নিকটবর্তী প্রত্যেক জায়গার জন্য যথেষ্ট, তখন সে কথার উদ্দেশ্য এত দূর নয় যে, সে দূরত্বের ফলে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে যাবে। হাদীস ও ফিক্বহের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ক'রে আমি এ কথাই বুঝেছি। এবারে আহলে ইল্ম বিশেষতঃ ফিক্বহ ও উসূলের সাথে যাঁরা সম্পর্ক রাখেন, তাঁদেরকে এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, এক জায়গায় চাঁদ হলে সব জায়গায় রোযা-ঈদ হওয়ার ক্ষেত্রে ফুক্বাহাগণ যে 'দূরবর্তী ও নিকটবর্তী' শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে ব্যাপারে আমার বুঝ কদ্দূর সঠিক?

আমার রায়ের ব্যাপারে আমি হঠকারী নই। আর না আমার রায়ই চূড়ান্ত ফায়সালা। এ কথাও স্পষ্ট করি যে, প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক্ব (সত্যানুসন্ধানী) আলেম ডক্টর বকর বিন আবূ যায়দ (রাহিমাহুল্লাহ) চাঁদ দেখার ব্যাপারে দর্শন-ভিন্নতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা ও তিন ইমামের মযহাব বলে প্রমাণ করেছেন।[১৮৩] যা আমার রায়কে সমর্থন করে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

অনুরূপ শায়খ মুস্তাফা যারক্বা যখন 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'তে ১৪০৬ হিজরীর অনুষ্ঠিত বৈঠকে অভিন্ন দর্শনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মযহাব বলে উল্লেখ করেন, তখন পর্যালোচনায় সভার সভাপতি শায়খ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন,

يا فضيلة الشيخ نقطة توضيحية بسيطة.. الحقيقة أن اختلاف المطالع هو الذي عليه الجمهور، وأنتم تفضلتم قلتم: أن الذي عليه الأكثر هو الجائز، حتى أن ابن عبد البر حكى الإجماع على اختلاف المطالع.

"ফযীলাতুশ শায়খ! সামান্য একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোকপাত করি,

[১৮২] মাউসাআতুল ফিক্বহিল মালেী ৫/৩৬৩
[১৮৩] ফিক্বহুন নাওয়াযিল ৩/৩৩৩

প্রকৃতপ্রস্তাবে উদয়স্থল-ভিন্নতার মযহাবই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার। কিন্তু আপনি বললেন, 'যে রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার তা জায়েয।' এমনকি ইবনে আব্দুল বার্র উদয়স্থল ভিন্নতার ব্যাপারে 'ইজমা' নকল করেছেন।"

শায়খ যারক্বা বললেন, 'মহাশয়! আহমাদের মযহাব হানাফীদের মতোই। উদয়স্থল-ভিন্নতা বিবেচ্য নয়। এ ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে।'

সভাপতি বললেন, 'আমরা বলি, ইমাম আহমাদের মযহাবে ও অন্যের মযহাবে আছে, আমরা বলি, অধিকাংশের উক্তি।'

শায়খ যারক্বা বললেন,

لكم رأيكم، أنا رأيي أنه يكفينا أن نلقى الله برأي إمامين عظيمين ولو خالفهما الأكثر.

"আপনাদের রায় আপনারা মানুন। আমার রায়, আমি দুই বড় ইমামের রায় নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা তাঁদের বিরোধিতা করেন। এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" [১৮৪]

এই জন্য যদি কোন ব্যক্তি দর্শন-অভিন্নতার বিপরীত এই বলে যে, পূর্বে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীন আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনদের এ ব্যাপারে 'ইজমা' আছে যে, উদয়স্থল অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দর্শন-অভিন্নতা মান্য হবে, তাহলে সে অনেকটাই হকের সপক্ষে হবে।

মোটকথা এই যে, উদয়স্থল-ভিন্নতার ভিত্তিতে চাঁদ দেখার বিধানও ভিন্ন হবে। এ পুস্তিকা-রচয়িতার মতও তাই। ইমাম হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) এ মতই এখতিয়ার করেছেন এবং সাহাবাগণ ﷺ-এর প্রায় 'ইজমা' (ঐকমত্য) নকল করেছেন। তিনি লিখেছেন,

قال أبو عمر إلى القول الأول أذهب لأن فيه أثرا مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة وقول طائفة من فقهاء التابعين ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم....

"আবূ উমার বলেন, আমি প্রথম মতকে গ্রহণ করছি। যেহেতু সে ব্যাপারে

[১৮৪] মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যড, ২য় খন্ড, ৯৯২পৃঃ

একটি 'মারফূ' হাদীস আছে এবং সেটি হাসান হাদীস, যার দ্বারা হুজ্জত কায়েম হয়। এ মত একজন বড় সাহাবী (ইবনে আব্বাস)এর, কোন সাহাবী তাঁর বিরোধী নন। তাবেঈনদের মধ্যে ফুক্বাহাদের একটি জামাআতের মতও তাই। এ ছাড়া আমার নিকট যুক্তিও সে কথা প্রমাণ করে। কেননা, যে জিনিস লোকেদের কাছে তাদের দেশের বাইরে অদৃশ্য, তার উপর তাদেরকে বাধ্য করা যায় না। যদি তা করা হয়, তাহলে তাদের উপর সংকীর্ণতা আনা হবে।" [১৮৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)ও উক্ত মত এখতিয়ার করেছেন। যেমন সে কথা তাঁর গ্রন্থ 'আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ' থেকে বুঝা যায়। [১৮৬]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ)ও উক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তিনি লিখেছেন, "নবী ﷺ-এর নির্দেশ 'যখন তোমরা চাঁদ দেখবে---' এ বিধানে তিনি রোযা ওয়াজেব হওয়ার জন্য চাঁদ দেখাকে হেতু বা কার্যকারণ বানিয়েছেন এবং তিনি ওয়াজেব করেছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ শহরের চাঁদ দেখা ও সময়কে মান্য করে। অন্য শহরের চাঁদ দেখাকে নয়। কারণ এক দেশ অন্য দেশ থেকে উচ্চতা-নিচুতায় ভিন্ন হয়ে থাকে। এই জন্য অনেক সময় এক শহরে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য শহরে তা দেখা যায় না। তাই প্রত্যেক এলাকার বিধান তার স্থানীয় ভূখন্ডে ও দেশে মান্য হবে, অন্যদের নয়।" [১৮৭]

ভারত-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে হাদীস উলামার মতও সেটাই। [১৮৮]

বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবূ সাঈদ শরফুদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ) ও হাফেয আব্দুল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিস রোপড়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এ

[১৮৫] আত-তামহীদ ১৪/৩৫৭

[১৮৬] ২৯পৃঃ, এখান থেকে বুঝা যায় যে, যাঁরা অভিন্ন দর্শনের কথা শায়খুল ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তাঁদের ধারণা সঠিক নয়।

[১৮৭] আ'লামুল হাদীস শারহুল বুখারী ২/৯৪৩

[১৮৮] ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ১/৪২৫, শায়খুল হাদীস মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) আল-মিরআত (৬/৩০৫-৩০৬ পুরাতন সংস্করণ)এ এবং রমযান বিষয়ক পুস্তিকার ৮-৯পৃষ্ঠায় উক্ত মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ব্যাপারে পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[১৮৯]

জনাব নবাব সিদ্দীক হাসান খান (রাহিমাহুল্লাহ) 'বুলূগুল মারাম'এর ব্যাখ্যাপুস্তক 'ফাতহুল আল্লাম'-এ উক্ত মতকেই এখতিয়ার করেছেন।[১৯০]

সঊদী আরবের মহামান্য উলামাগণের স্থায়ী ফতোয়া কমিটিও উক্ত মতকে সঠিক বলেছেন।[১৯১]

মক্কার 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী'র অধীনে কর্মরত কমিটি 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী' উক্ত রায়ের সমর্থনে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে।[১৯২]

বরং সঊদী আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা ও উলামা উক্ত মত অবলম্বন করেছেন এবং নিজ নিজ ফতোয়াতে উক্ত মতকেই সবিশদ বিবৃত করেছেন। বিশেষ ক'রে শায়খ মুহাম্মাদ বিন উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) একাধিক ফতোয়াতে উক্ত বিষয়টিকে দলীল-সহ বয়ান করেছেন।[১৯৩]

খোদ মহামান্য (সঊদী আরবের প্রধান মুফতী) আল্লামা ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ)ও এ মতটিকে দলীলের দিক থেকে বলিষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন।[১৯৪] অথচ তাঁর মত ও ফতোয়া হল, অভিন্ন দর্শন গণ্য হবে। সুতরাং তিনি এক ফতোয়াতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ-এর হাদীস নকল করার পর লিখেছেন,

وهذا قول له حظه من القوة ، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء

(১৮৯) দেখুনঃ ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ১/৬৫৯, ফাতাওয়া আহলিল হাদীস ৩/৩০৯

(১৯০) ফাতহুল আল্লাম ২/৬৯০, বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যাতা আমীর ইয়ামানী (রাহিমাহুল্লাহ)ও 'সুবুলুস সালাম' (২/৩১০)এ উক্ত রায়কে সঠিক বলেছেন।

(১৯১) আবহাষু হাইআতি কিবারিল উলামা ৩/২৯, ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায ১৫/৭৪

(১৯২) মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২/৯২৫, আরো দেখুন ঃ ক্বারারাতুল মাজমাইল ফিক্বহিল ইসলামী ৮২-৮৩পৃঃ

(১৯৩) দেখুনঃ ফাতাওয়া অরাসাইল শায়খ আব্দুর রায্যাক আফীফী ৪২৩পৃঃ, আল-মুন্তাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ আল-ফাওযান ৩/১২৩-১২৫, ফাতাওয়া রামাযান ১০৬-১০৭পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৯/৪৪-৬২

(১৯৪) এ কথা এই জন্য বলা হচ্ছে যে, লোকেরা যখন এ মাসআলা নিয়ে বলাবলি বা লেখালেখি করে, তখন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম---বিশেষ ক'রে ইবনে বাযের নাম---বড় জোরদার ভঙ্গিমায় নিয়ে থাকে। (কিন্তু আমরা বরাবর দেখে আসছি, অন্য দেশের চাঁদের ভিত্তিতে সঊদী আরবে রোযা-ঈদ হয় না।---অনুবাদক)

في المملكة العربية السعودية . جمعاً بين الأدلة والله ولى التوفيق.

অর্থাৎ, এই (নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা ঈদ করার) অভিমত বলিষ্ঠ হওয়ার উপযুক্ত। দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সঊদী আরবের উচ্চ পদস্থ উলামা কমিটির সদস্যগণ উক্ত অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আল্লাহই তাওফীকের অধিকারী।[১৯৫]

অভিন্ন-দর্শনের সমর্থনে যেখানে এ কথার উপর জোর দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনদের রায় এটাই, সেখানে এই যুক্তিকেও বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যে, ঈদুল ফিত্র, ঈদুল আযহা ও রোযা ইত্যাদিতে মুসলিমদের ঐক্য-বন্ধনে উপকার সাধন হবে এবং মুসলিমদের সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অন্যথা এ কথা বড়ই বিবেক-বহির্ভূত যে, একই কলেমা-পাঠক মুসলমান নিজেদের বার্ষিক পাল-পার্বণে ছিন্ন-ভিন্ন পরিদৃষ্ট হবে। কেউ বৃহস্পতিবার ঈদ পালন করছে, আবার কেউ তার আগে বুধবার ঈদ ক'রে নিয়েছে, আবার কেউ শুক্রবার পালন করবে। আর এইভাবে মুসলমান বিজাতির দৃষ্টিতে হাস্যাস্পদ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটি এমন এক যুক্তি, যেটাকে আল্লামা আহমাদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) অনেক প্রচার করেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য যাঁরাই এ বিষয় উত্থাপন করেছেন, তাঁরাই তা পেশ করেছেন।[১৯৬]

উক্ত মহাশয়গণের আবেগ ও অনুভূতি কদরযোগ্য। কিন্তু বাস্তব এই যে,

প্রথমতঃ অভিন্ন দর্শনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই সে আবেগমথিত আশা পূরণ হবে না। চাহে দুনিয়ার যে কোন জায়গাকে চাঁদ দর্শনের বিশেষ কেন্দ্র মেনে নেওয়া হোক অথবা ব্যাপক ছেড়ে দেওয়া হোক। যেহেতু মহান আল্লাহ দিবারাত্রির আগমন-প্রস্থানের এমন কিছু শৃঙ্খলা রেখেছেন যে, কথিত ঐক্য সম্ভবই নয়। যেমন এর কিছু উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আরো একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য।

বিদিত যে, ফিজি দ্বীপে যখন সকাল হয়, তখন লন্ডনে সেই সময় সূর্য অস্তে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। আর ফিজিতে এই সকাল সেই সকাল হয়, যে সকাল লন্ডনে এখনও ১২ ঘন্টা বা তারও কিছু পরে উদিত হবে। এই অবস্থায় যদি

(১৯৫) ফাতাওয়া ইবনে বায ১৫/৮৪

(১৯৬) দেখুনঃ মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ২য় খন্ড

লন্ডনে রোযা বা ঈদের চাঁদ দেখা যায়, তাহলে ফিজিবাসীদের বিধান কী হবে? যদি তাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে তারা ফজর উদয় হওয়ার আগে রোযার নিয়ত করেনি। বরং যেহেতু তাদের ওখানে এখন শা'বানের ২৮ বা ২৯ তারীখ হবে, সেহেতু রাত্রে রোযার নিয়ত করার প্রশ্নই উঠে না। অতঃপর তাদেরকে যদি রোযা রাখার নির্দেশ না দেওয়া হয়, তাহলে একই দিনে রোযা রাখার সমস্যার সমাধান লাভ হয় না। এরই উপর ঈদকে অনুমান ক'রে নিন। অনুরূপ যদি একই দূরত্ব পূর্বের দিকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রোযা ও ঈদের মধ্যে একতার সমস্যা আরো কঠিন পরিদৃষ্ট হবে। এই জন্য হক এটাই যে, চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মুসলমানদের রোযা ও ঈদে একতার সমস্যা শুধু কঠিনই নয়, বরং অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানীদের ভেবে দেখার দরকার আছে।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন সাধন ক'রে অথবা তার ব্যাপারে উদারপন্থা অবলম্বন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। বরং মানুষের দেহ-মন ও সমাজে ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে ইসলামী ঐক্যের নিশ্চয়তা আছে। যদি সেটাই অবর্তমান থাকে, তাহলে রোযা, ঈদ ও কুরবানী ইত্যাদিতে একতা প্রতিষ্ঠা ক'রে মুসলিমদের প্রকৃত শক্তি বহাল হতে পারে না।

(উম্মত কত শত বিষয়ে শতধাবিচ্ছিন্ন। আকীদা, ইবাদত, আচরণে কত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন। জাতীয়তাবাদ, ফির্কা, দল ও মযহাবী কোন্দলে ঐক্যহারা, অন্তর্দ্বন্দ্বে পরস্পর শত্রু। তার উপর রোযা-ঈদের বিতর্কিত ঐক্যের প্রলেপ দিয়ে সে শত ফাটলের উপর দিক চাপা দিয়ে কী লাভ হবে?)

অতীতের অনতি দূরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রোযা ও ঈদকে এক দিনে পালন করার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠাকরণের আওয়াজ নতুন নয়। সুতরাং আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে পাকিস্তানে এই দাবীর আওয়াজ উঠেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের রোযা ও ঈদের মধ্যে ঐক্য থাকা উচিত। একবার এমন হল যে, পূর্ব পাকিস্তানে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না পাওয়া সত্ত্বেও জোর ক'রে ঈদ পালন করা হল এবং জনগণকে বলপূর্বক রোযা ছাড়তে বাধ্য করা হল। এই ঘটনার পর মওলানা ইসমাঈল সাহেব গুজরানওয়ালা (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-ই'তিস্বাম' পত্রিকার ৭ই এপ্রিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে চাঁদ দেখার ব্যাপারে আলোচনা

করেছিলেন। সবশেষে তিনি 'ঈদ ও জাতীয় ঐক্য' শিরোনামে লিখেছিলেন, উনত্রিশ রমযান রেডিওর খবরে জানা গেল যে, ঢাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কমিশনার সাহেব সেখানেও ঈদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জানা নেই, কেন করলেন?

মোটকথা উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি প্রকৃতত্ব। কেবল ঈদকেই জাতীয় ঐক্যের দলীল মনে করা প্রকৃতত্ব ও বাস্তবতার প্রতিকূল। যদি ঢাকায় ঈদ রবিবারে হতো, তাহলে তাতে জাতির কোন ক্ষতি হতো না। ভৌগোলিক অভিজ্ঞদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন, যদি ঢাকার উদয়স্থল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তাদেরকে ঈদ পালনে বাধ্য কেন করা হবে? কমিশনার সাহেব হাজার-হাজার রোযা ভাঙ্গার অথবা রাখার গোনাহ নিজের ঘাড়ে কেন নেবেন? এ কাজ না শরয়ীভাবে সঠিক, না যুক্তিগতভাবে। ভূগোলবিদ্‌গণ এ ফতোয়া দিতে পারবেন। মুসলমান আল-হামদু লিল্লাহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তাদের সকলের জন্য একই দিনে ঈদ পালন করা সম্ভবই নয়। আর না তাতে ঐক্য শরয়ীভাবে প্রার্থনীয়। হিজায, মিসর ও শামদেশে ঈদ জুমআর দিনে হলে জাতীয় ঐক্যে কোন ক্ষতি আসবে না। ঢাকায় চাঁদ না দেখার ফলে যদি ঈদ রবিবার হয়, তাহলে তাতে জাতীয় ঐক্যে কী এমন ক্ষতি সাধিত হবে? বরং জাতীয় ঐক্য আছে এ কথায় যে, জাতি শরীয়তের নির্দেশ ও রীতি-নীতি সঠিকভাবে পালন করুক। দূরদর্শিতার পরিচয় এই যে, যখন এত দূরের এলাকায় চাঁদ দেখা যায়নি, তখন ব্যাপারটাকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হোক। মীমাংসিত মাসায়েলের বিপরীত জনগণকে কিছু বলা প্রশাসনের গরিমার দাবী আদৌ নয়।[১৯৭]

([১৯৭]) ফাতাওয়া সালাফিয়্যাহ ৫৮পৃঃ

সমাপ্তি ও কিছু আবেদন

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে চাঁদ দেখা ও অভিন্ন দর্শন বিষয়ক গবেষণাধর্মী আলোচনা সমাপ্ত হল। বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ অধ্যয়ন এবং আহলে ইল্মের উক্তিসমূহের সম্বল সাথে এত লম্বা সফর অতিক্রম করার পর পুস্তিকা-রচয়িতা যে পরিণামে পৌঁছেছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

১। মুসলিমদের জন্য ওয়াজেব, নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবীর সকল ক্ষেত্রে শরয়ী (হিজরী) মাস ব্যবহার করতে যত্নবান হওয়া। যেহেতু এ মাস মহান স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত। আর সেটাকে তিনি 'সরল বিধান' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২। মহান আল্লাহ চাঁদ-দর্শনকে শরয়ী মাসসমূহ জানার একমাত্র উপায় নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে তার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। এই জন্য মুসলিমদের উচিত, আমভাবে সারা বছর এবং বিশেষভাবে শা'বান, রমযান, যুলহজ্জ ইত্যাদি মাস প্রমাণের জন্য চাঁদ দেখতে যত্নবান হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা এটাকে 'ফরযে কিফায়াহ' বলেছেন।

৩। শরয়ী মাসসমূহের শুরু ও শেষ নির্ধারণের ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ্যা ও তিথি হিসাবের উপর ভরসা বৈধ হবে না। অবশ্য আধুনিক টেকনোলোজি ও খগোলবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে সবকে ভিত্তি বানানো যাবে না।

৪। এটা এমন একটা মাসআলা, যার উপর উম্মতের উলামাগণ একমত; যার বিরোধিতা বৈধ নয়। যেহেতু উম্মতের ইজমা'র বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

"যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি

সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (নিসা ঃ ১১৫)

৫। যে কয়জন ফুক্বাহা থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত আছে, তাঁদের ব্যাপারে বলা যায় যে,

প্রথমতঃ তাঁদের অধিকাংশের প্রতি সে মতের সম্পর্ক জোড়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা একটি সীমিত গন্ডির ভিতরে খগোলবিদ্যার উপর নির্ভর করা বৈধ বলেছেন।

তৃতীয়তঃ তাঁদের এ আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা কর, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো, তোমাদের আকাশে মেঘ থাকলে গণনা পূরণ ক'রে নাও"---এই বাণীর বিরুদ্ধাচরণ।

চতুর্থতঃ সাহাবায়ে কেরাম ﷺ, তাবেঈনে এযাম এবং তাঁদের পরবর্তী তাঁদের অনুসারী ইমামগণের ঐকমত্য তাঁদের বিপক্ষে দলীল।

৬। খগোলবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপার এখনও পর্যন্ত ধারণার গন্ডিতে সীমাবদ্ধ এবং বিভিন্নভাবে তা শরীয়তের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। এই জন্য তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৭। চাঁদের উদয়স্থল-ভিন্নতা কেবল ভৌগোলিক বাস্তবতাই নয়, বরং সুদৃঢ় শরীয়তের উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, উদয়স্থল-ভিন্নতা একটি অনায়াসবোধ্য বিষয়। (স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় জানা যায়।)

৮। অবশ্য উলামাগণের এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, উদয়স্থল-ভিন্নতা রোযা ও ঈদ পালন করার জন্য প্রভাবশীল অথবা তা একটা ভৌগোলিক বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের ইবাদতের উপর কোন প্রভাবশীল নয়। অন্য কথায়, উদয়স্থল-ভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামী বিশ্বের জন্য কোন এক জায়গার দর্শন যথেষ্ট অথবা প্রত্যেক শহর ও দেশবাসীরা নিজ নিজ এলাকার দর্শন গণ্য করতে বাধ্য।

৯। উক্ত মতভেদের বিশদ বিবরণে নানা মুনির নানা মত ও তাঁদের নিজ নিজ দলীল আছে, যা পুস্তিকার মূলাংশে উল্লিখিত হয়েছে।

১০। এ ব্যাপারে দুটি রায় অধিক শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ঃ-

(ক) দুনিয়ার কোন জায়গায় যদি চাঁদ দেখার কথা প্রমাণিত হয়, তাহলে বিশ্বের সকল মুসলিমকে সেই ভিত্তিতে আমল করা উচিত।

(খ) উদয়স্থল অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন-দর্শন গণ্য হবে এবং যে এলাকার উদয়স্থল ভিন্ন, সে এলাকার দর্শনও ভিন্ন হবে।

অবশিষ্ট অন্যান্য রায়সমূহ উক্ত উভয় রায়ের ভিতরে বিন্যস্ত অথবা তার সপক্ষে কোন বলিষ্ঠ দলীল নেই।

১১। বিশেষ ক'রে 'মক্কা মুকর্রামার চাঁদে সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে রোযা-ঈদ করতে হবে'---এই রায় দলীল থেকে বিলকুল দূরে অথবা এ রায় একটা বিরল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য অভিমত। এ রায় না আল্লামা শাকের (রাহিমাহুল্লাহ)র পূর্বে কোন আলেমের ছিল, আর না-ই তাঁর পরের কোন উল্লেখযোগ্য আলেম তার সমর্থন করেছেন। বরং বাস্তব এই যে, আল্লামা (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ঐ রায় প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন।

১২। কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী কালের উলামাগণের আমলের ভিত্তিতে পুস্তিকা-রচয়িতার নিকট প্রাধান্যযোগ্য রায় এই যে, চাঁদ দেখায় উদয়স্থলের ভিন্নতার প্রভাব অবশ্যই পড়ে। এই জন্য যে এলাকার উদয়স্থল ভিন্ন, সে এলাকায় অভিন্ন দর্শন মান্য হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা ও মুহাদ্দিসীনের রায় এটাই।

১৩। যে কথা বলা হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা ও মুহাদ্দিসীন অভিন্ন দর্শনের পক্ষে, তো এ দাবী দলীল থেকে শূন্য এবং বাস্তব থেকে বহু দূরে। হ্যাঁ, যদি এ কথা বলা হয় যে, চার মযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুক্বাহা অভিন্ন দর্শনের পক্ষে, তাহলে তা কোন প্রকারে স্বীকার করা যেতে পারে।

১৪। প্রকাশ থাকে যে, যে সকল উলামা অভিন্ন দর্শনের পক্ষে, তাঁদের কাছেও তার দলীল আছে এবং সেই দলীলসমূহের একটা ওজনও আছে। মানুষের মনে সেই উলামাগণের একটা স্থানও আছে। এই জন্য সেই দলীলসমূহ সামনে রেখে তাঁদের বিপরীত মত পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাঁদের রায়কে শ্রদ্ধা করা জরুরী। খুব সম্ভব যে, হক তাঁদের সাথী। কিন্তু পুস্তিকা-রচয়িতা যথাসাধ্য সত্যানুসন্ধানী প্রয়াস চালানোর পরেও যে পরিণামে উপনীত হয়েছে, আমানতদারীর সাথে তা প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী

ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক।"

১৫। এতদ্সত্ত্বেও পুস্তিকা-রচয়িতা এটাই উত্তম মনে করে যে, কোন জায়গার জনসাধারণ ও তালেবে-ইল্ম (ছোট আলেম) নিজেদের এলাকায় বসবাসকারী উলামা ও তাঁদের রায় থেকে ভিন্ন মত পোষণ ক'রে পৃথক বৈশিষ্ট্য তৈরি না করেন। বরং যদি কোন জায়গার আহলে ইল্ম অভিন্ন দর্শনের পক্ষে থাকেন, তাহলে সেখানকার জনসাধারণের সকলের জন্য তাঁদের আনুগত্য জরুরী। এ হল উম্মতের একতার জন্য পরশমণির মতো।

১৬। জমঈয়তে আহলে হাদীস সেমিনারে অংশগ্রহণকারী আহলে ইল্ম ও লেখকদের কাছে কতিপয় আবেদন ঃ

অভিন্ন দর্শনের মান্যতা বা অমান্যতা নিছক একটি ইল্মী মাসআলা। প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যেক যুগেই উক্ত মাসআলায় মতানৈক্য থেকে গেছে। ভারত-পাকিস্তানের অধিকাংশ উলামায়ে আহলে হাদীস; বরং অনেক বেশি সংখ্যক উলামা অভিন্ন দর্শনের বিপক্ষে। বরং সউদী আরবের অধিকাংশ আহলে ইল্মই উক্ত রায়ের সপক্ষে। এই জন্য জরুরী হল, এই মাসআলাকে জনসাধারণের সামনে প্রচার করার পূর্বে আহলে ইল্মদের মাঝে গবেষণা-পর্যালোচনার অবস্থা অতিক্রম করা। কেননা যদি এ মাসআলাকে আম জনসাধারণের মাঝে সংবাদ-মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ও জালসা-জলূসে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তার ফল বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য আকারে প্রকাশ পাবে। যেমন একাধিক দেশে এ কথার উদাহরণ বিদ্যমান আছে। কেননা, আম জনসাধারণ, নব-যুবক ও নিম-আলেম মানুষ সাধারণতঃ বড় আবেগময় হয়। এই জন্য যখন তাদের নিকটে এই শ্রেণীর মাসআলা আসে, তখন তারা কারো প্রতি অন্ধভক্তি অথবা নিজ স্বল্প বুঝের কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। যার কুফল স্বরূপ মুসলিমদের জামাআত; বরং খোদ জমঈয়তই বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির শিকার হয়ে যায়। দূর ও অদূরের অতীতে এ কথার একাধিক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ভিত্তিতে আমার রায় এই যে, জমঈয়তে আহলে হাদীস যখন উক্ত মাসআলা উপস্থাপন করেছে, তখন উলামা ও চিন্তাবিদদের সহযোগিতায় এ ব্যাপারে ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা ক'রে এমন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করুক, যার উপর সমস্ত

লোক আমল করতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে খগোলবিদ্যার অভিজ্ঞদেরও সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। কত ভালো হয়, যদি অন্য জামাআতের আহলে ইল্‌ম ও ফিক্বহদেরকেও নিজেদের রায় পেশ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় এবং মাসআলায় বেশ ভালোরূপে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পুনর্বিবেচনা করার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা ভারতবর্ষের সকল এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী আমলের জন্য মানুষকে আহবান জানানো হয় এবং উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

আমি মনে করি, এ কাজ কঠিন নয় এবং ভারতের মাটি উলামা ও চিন্তাবিদশূন্যও নয়। জানানোর জন্য নয়, বরং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি যে, মক্কার 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী'র অধীনে কর্মরত কমিটি 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'তে বিষয়টি নিয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা হয়েছে এবং তাতে প্রত্যেক মতাদর্শের উলামা নিজ নিজ রচনা ও তর্কালোচনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, আর সে রচনা ও তর্কালোচনা নিজ নিজ শব্দ ও বাক্যে পুস্তকাকারে বিদ্যমান রয়েছে। সে সব পুস্তক থেকে যথেষ্ট উপকৃত হওয়া যায়। আমি মনে করি, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বাকী রাখার জন্য বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে এ কাজ খুবই জরুরী এবং তা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ক্ষমতার বাইরে নয়।

অবশ্য যত দিন না উক্ত মাসআলা পর্যালোচনা ও গবেষণার ভাটিতে পুড়ে পরিপক্ব হয়ে না আসছে, তত দিন উম্মতকে সেই তরীকার উপর থাকতে দেওয়া হোক, যে তরীকায় ১৪ শতাব্দী ধরে চলমান আছে। এই অবসরে প্রত্যেক এলাকার আহলে ইল্‌ম, মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেবগণের প্রতি আবেদন যে, আপনারা জনসাধারণকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং জাতির ঐক্যকে কোনভাবেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দেবেন না।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী! এ কথা যেন কেবল (চাঁদের) অভিন্ন দর্শনের গন্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং অন্যান্য সেই সকল মাসায়েল, যা মুসলিম উম্মাহ ও বিশেষ ক'রে জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাঝে অনৈক্যের হেতুরূপে প্রকাশ পায়, তার ব্যাপারেও অনুরূপ ভাবনা-চিন্তা রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, আহলে হাদীসের উলামাগণ কোন বিষয়ে একমত হন, কিন্তু কোন তালেবে ইল্‌ম---যে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান-বুঝ এবং বিবেক ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করে, কখনো-কখনো উলামায়ে

আহলে হাদীস বিরোধী নিজের অসম্পূর্ণ তাহক্বীক্ব অথবা যে আলেমের তাহক্বীক্বে সে মুগ্ধ ও প্রভাবিত, তাঁর তাহক্বীক্ব পড়ে মতানৈক্যের পরোয়া না ক'রে তাঁর প্রয়াস থাকে যে, সেই তাহক্বীক্বকে জনসাধারণের (মনে চমক ধরানোর উদ্দেশ্যে তাদের) সামনে প্রচার করতে শুরু করে। চাহে লেখার মাধ্যমে হোক বা বক্তব্যের মাধ্যমে, পুস্তক আকারে হোক বা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গবেষণা আকারে। অথচ তার ফলাফল প্রকৃষ্ট হতে নজর আসে না। বরং সাধারণ মানুষ, অল্প শিক্ষিত যুবক এবং আবেগময় দ্বীনদারদের কারণে জমঈয়ত ও তার অনুসারীদের মাঝে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। আর তার ফলে জমঈয়তে আহলে হাদীস অন্য জামাআতের কাছে হাসির পাত্র হয়ে যায়। এটা এমন বিষয়, যা আপনারা আমার থেকে বেশি জানবেন। এই জন্য জরুরী এই যে, যে কোনও এমন মাসআলা, যার উপস্থাপনার ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে বিক্ষিপ্ততা ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তা আম জনতার মাঝে প্রচার-প্রসার করা থেকে বিরত থাকা। দর্স-তাদরীস এবং ইল্‌মী মজলিসে এমন মাসআলা উল্লেখ করা সংগত। হকসন্ধানী উলামার সত্যায়ন ব্যতীত আম মানুষদের সামনে এমন মাসায়েল উল্লেখ করা আদৌ সমীচীন নয়। নিম্নের একটি ঘটনার উল্লেখ আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিখ্যাত তাবেয়ী উবাইদাহ সালমানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদা হযরত আলী ﵁ ফতোয়া দিলেন যে, উম্মে অলাদ (প্রভুর সন্তানের জন্মদাত্রী ক্রীতদাসী) বিক্রয় করা বৈধ। (অথচ ইতিপূর্বে তাঁর রায় ছিল উম্মে অলাদ বিক্রয় বৈধ নয়। হযরত উমার ﵁-এরও একই রায় ছিল।) আমি হযরত আলী ﵁-কে বললাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার এবং হযরত উমার ﵁-এর কোন মাসআলায় একমত থাকা অধিক উত্তম। কেননা, আপনাদের উভয়ের মাঝে মতানৈক্যের ফলে লোকেদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদের আশঙ্কা আছে। হযরত আলী ﵁ সেই সময় যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আহলে ইল্‌মের পথ চলার জন্য আলোকবর্তিকার ন্যায়। তিনি উত্তরে বললেন,

اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي....

"তোমরা পূর্ব হতে যেরূপ ফায়সালা দিয়ে আসছিলে, সেইরূপ ফায়সালা দাও। কারণ আমি মতভেদ করাকে অপছন্দ করি। যাতে লোকেদের জন্য (একতাবদ্ধ)

জামাআত হয়। অথবা আমি মারা যাই, যেভাবে আমার সঙ্গীরা মারা গেছেন।”(১৯৮)

উক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, উম্মতের ঐক্য কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! তাই অনেক সময় নিজের কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং দলীল হিসাবে বলিষ্ঠ মাসআলার ব্যাপারেও নীরবতা এখতিয়ার করতে হয়। এই জন্য সকল আহলে ইল্ম ও লেখক মহাশয়গণের নিকট আদবের সাথে আমার আবেদন এই যে, এমন মাসআলা, যার বিপক্ষে কোন জায়গার উলামার ঐকমত্য আছে, তা উপস্থাপন করা এবং তাকে জনসাধারণী মাসআলা বানানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

আমার এ উদ্দেশ্য মোটেই নয় যে, বক্তা ও লেখকবৃন্দ 'হক' প্রকাশে নিজেদের জিহ্বা ও কলমকে নিবারিত রাখবেন। বরং আমার উদ্দেশ্য হল, 'লিকুল্লি মাক্বামিন মাক্বাল' (স্থানবিশেষে কথা বলা)র কৌশল অবলম্বন করা হবে এবং কোন মাসআলার তাহক্বীক্বের জন্য আহলে ইলমের সাথে বিশেষ সম্পর্ক কায়েম করা হবে। কোন ইল্মী কিতাব বা কোন ইল্মী পত্রিকায় গবেষণা ও তর্কালোচনা হিসাবে পেশ করা হবে। মাসআলার গুরুত্ব অনুসারে হকপন্থী উলামাগণের আপাতকালীন মিটিংও আহবান করা যেতে পারে। আর এ কাজ জমঈয়তের আওতা-বহির্ভূত নয় এবং দ্বীনী মাদ্রাসা ও ইল্মী দর্সগাহসমূহের কর্মসীমার বাইরেও নয়।

এ ছিল কতিপয় আবেদন, যা আহলে ইল্ম ও জমঈয়তের দায়িত্বশীলগণের খিদমতে রাখা আবশ্যক মনে করেছিলাম। যদি তা 'হক' হয়, তাহলে গ্রহণ করা হোক, আর যদি 'হক' না হয়, তাহলে আমিও একজন মানুষ, যার ভিতরে ভুল ও বিস্মৃতি প্রক্ষিপ্ত আছে। এর জন্য শত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা মঞ্জুরকারীর নিকটে প্রার্থনা,

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

সমাপ্ত

(১৯৮) বুখারী ৩৭০৭নং